প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রী অমিয়কুমার সেন

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা
রবীন্দ্রভবন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

অমিয়কুমার সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা

৭ পৌষ ১৩৫৪

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচি

অবতারণা

উন্মেষ

ক্রমবিকাশ

পরিণতি

ঋতুসংগীত

নিবেদন

রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ এবং পরিণতি নিয়ে বাংলাসাহিত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আরও নানা দিক্ থেকে আলোচনা করবার অবকাশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে তাঁর কবিপ্রতিভার মূল উপাদানটি নিহিত আছে। তাঁর কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে এই উপাদানটি কি ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে বর্তমান গ্রন্থে তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি। প্রকৃতিপ্রেম রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের শুধু একটি বিশেষ লক্ষণমাত্র নয়, এটা তাঁর কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং প্রকৃতির কবিরূপে তাঁর বিশিষ্টতা দেখাতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর বিচিত্র প্রতিভার অন্যান্য দিক্গুলির প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়েছে।

কয়েক বৎসর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা উপলক্ষ্যে বাংলা-কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। সেটি পরীক্ষকগণ-কর্তৃক গৃহীত ও প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতিপ্রেমের বৈচিত্র্য এবং গভীরতা নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে উক্ত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগের আলোচনাতেই আবদ্ধ রেখেছিলাম। তখন থেকেই ওই গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে বর্তমান গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করি। পরে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসাহিত্য গবেষণা উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হল। কর্তৃপক্ষ এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে, এই দুটি গ্রন্থে সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের একটি দিকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যাবে।

বিশ্বভারতীর বাংলাসাহিত্যের রবীন্দ্রঅধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের সহকারীরূপেই এই গ্রন্থরচনার সুযোগ লাভ করেছি। গ্রন্থ রচনা এবং সম্পাদনার প্রত্যেক পর্বেই তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য এবং উপদেশ লাভ করেছি। তিনি গ্রন্থখানি আগাগোড়া দেখে এবং স্থানে স্থানে নির্দেশ দিয়ে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থ রচনার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছিলাম।

বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সে আলোচনা যথেষ্ট কাজে লেগেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এবং বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত পূর্ববর্তী এবং বর্তমান গ্রন্থ রচনায় আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সস্নেহ আনুকূল্য না পেলে এই গ্রন্থ এত শীঘ্র প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। গ্রন্থখানি মুদ্রণ এবং প্রকাশের ব্যাপারে বিশ্বভারতী কোয়ারটারলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়ের কাছ থেকে অকুণ্ঠ পোষকতা লাভ করেছি। এঁদের আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থসম্পাদনায় ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীমোফাজ্জল হায়দার, সহকর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী গার্গী সেন সাহায্য করেছেন। নির্দেশিকাটি রচনা করেছেন ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য। এঁদের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক নয়।

রবীন্দ্রভবন,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৫৪

অমিয়কুমার সেন

সূচনা

শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার মধ্যে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁদের বিশিষ্ট মতবাদ অবলীলাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বসৃষ্টিতে বা পার্থিব জীবনধারায় আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যে সংগতি এবং সুষমা আবিষ্কার করতে পারিনে, কবির সন্ধানী দৃষ্টিতে সে সংগতির রহস্য, সে সুষমার ইঙ্গিতটুকু সহজেই ধরা পড়ে। তাই কাব্যসৃষ্টিতে কবির বিশেষ প্রেরণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমগ্রতাকে উপভোগের সীমার মধ্যে ধরতে গেলে যে-জিনিসটা আমাদের চোখে বড়ো হয়ে ওঠে সেটা হল সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলে কবির জীবনে এক সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতির পরিচয়। এই ঐক্যানুভূতির গভীরতায় সৃষ্টির সমস্ত খণ্ড জিনিসের তুচ্ছতাকে তিনি এক অখণ্ডতার সঙ্গে যুক্ত করে সার্থক করে তুলেছেন, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে একটি বৃহত্তর অর্থ আবিষ্কার করেছেন; মানবের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কাহিনীও তাঁর চোখে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও অতৃপ্তিকে যখন এক অখণ্ড সত্তার লীলাবৈচিত্র্যের প্রকাশ বলে উপলব্ধি করেছেন তখন দুঃখও তার কাছে মধুর হয়েছে, মৃত্যু বহন করে এনেছে শান্তির স্পর্শ।

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।

এই ঐক্যের উপলব্ধি তাঁকে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের প্রতি সচেতন করে তুলেছে, কারণ দুইই হচ্ছে এক অখণ্ড সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই অখণ্ড সত্তাই কবির বিশ্বদেবতা। বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবজীবনকে যখন কবি বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা বলে জানতে পেরেছেন তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়ই কবির চোখে অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই জীবনের বিশেষ পর্বে মানবপ্রীতি তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছে,

কখনো প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য তাঁকে বেশি করে আকর্ষণ করছে, কখনো আবার বিশ্বদেবতা বা ভগবানের অসীমত্বের উপলব্ধিই তাঁর কাব্যের মূল সুর। এর কোনো পর্বই তাঁর কাব্যজীবনে প্রক্ষিপ্ত নয়। তিনের মধ্যে যোগসূত্রটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই কবি মানবপ্রীতি এবং প্রকৃতিপ্রেমের রাজ্য থেকে মাঝে মাঝে ভগবৎভক্তির রাজ্যে যাত্রা করেছেন। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি ইত্যাদির যুগে কবি তাঁর সধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ এক নূতন দেশে প্রবাসযাপন করেছেন, এরকম মত কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। বলাকাতেও সে প্রবাসযাপনের স্মৃতি মিলিয়ে যায়নি, তাই বস্তুবিশ্বের পরিবর্তে কবির কাব্যের বিষয় হয়েছে কালবিশ্বের জগৎ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই মতের সত্যতা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। জগৎ এবং জীবন যাঁর কাছে ভগবানের প্রকাশ, ভগবদ্‌ভক্তি তাঁর সধর্ম; খণ্ড এবং বিক্ষিপ্ত বস্তুকে যিনি অনাদি কালের প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন কালবিশ্বের জগতে অবস্থান তাঁর পক্ষে নূতন দেশে প্রবাস-যাপন নয়। বলাকার পরে পূরবী এবং মহুয়ার যুগে কবির বিশ্বপ্রকৃতি উপভোগের মধ্যে যে কারুণ্য এবং বিষাদ দেখতে পাই অপরিচিত দেশে প্রবাসযাপনের স্মৃতি তার কারণ নয়, তার কারণ চিরপরিচিত দেশের আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কা।

প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র সৃষ্টির এই ঐক্যানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির মধ্যে একটি পৃথক্ সত্তার সন্ধান লাভ করে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমের সম্পর্কও তিনি স্থাপন করেছেন কিন্তু এই সত্তাটিকে বিশ্বস্রষ্টার অসীম সত্তার একটি প্রকাশ রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সম্পর্কটি গভীরতর সার্থকতা লাভ করেছে। মানুষও বিশ্বস্রষ্টার অন্যতম প্রকাশ, সুতরাং মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে একটি বৃহত্তর ব্যঞ্জনা আছে। সে ব্যঞ্জনাও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুরঞ্জিত করেছে। তাই একের প্রেম থেকে অন্যের প্রেমের রূপান্তর তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে।

২

প্রকৃতিকে সজীব সত্তারূপে কল্পনা তথা বিশ্বদেবতা মানবজীবন ও প্রকৃতির মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রের সন্ধানলাভ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার উত্তরাধিকার। বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবের মধ্যে থেকেই চিরদিন ভারতবর্ষের মন বেড়ে উঠেছে পরিপূর্ণতার দিকে। প্রকৃতির সজীব চেতনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে অনুভব করা ভারতীয় মননধারার বৈশিষ্ট্য। জগতের জড় উদ্ভিদ্ ও চেতনের মধ্যে যে বিশ্বপ্রাণ নিরন্তর স্পন্দিত তারই উপলব্ধি তপোবনবাসী ভারতীয় সাধকের চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

—কঠোপনিষদ্ ২।৩।২

পরম প্রাণের লীলা থেকে নিঃসৃত হয়ে এরা সমস্ত প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। ওষধিতে বনস্পতিতে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে ঋতুতে ঋতুতে যে পরম প্রাণের স্পর্শ, তাঁর চরণেই ভারতবাসীর অধ্যাত্মজীবনের নমস্কার চিরকাল পৌঁছেছে।

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

—শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্ ২।১৭

আবাল্য উপনিষদের আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত রবীন্দ্রমানস ভারতীয় চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্যটুকু সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত করেছিল। তাঁর কাব্যসাধনায় এই উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তিনিও বিশ্বদেবতার সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

প্রকৃতির জড় এবং চেতনের সঙ্গে ভারতীয় মনের নিবিড় আত্মীয়তা প্রাচীন ভারতীয় কাব্যগুলির মধ্যে সুন্দর অভিব্যক্তি পেয়েছে। মানবের জীবননাট্যে প্রকৃতিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা গ্রহণের জন্য তার কোনো আলংকারিক উপায় গ্রহণ করতে হয়নি, অতি স্বাভাবিক উপায়েই সে প্রয়োজন সাধিত হয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে মানবসুলভ গুণের আরোপ করে

তাদের মানুষের দুঃখসুখের অংশীদার করে তোলার চেষ্টা ভারতীয় সাহিত্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু বহুস্থলে কোনো রূপক অবলম্বন না করেই প্রকৃতি কাব্যের অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠেছে। শকুন্তলানাটক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলানাটকের এই বিশেষত্বটি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব এমন প্রত্যক্ষ এমন ব্যাপক এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধনা করাইয়া লওয়া এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃ-প্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না'। শকুন্তলানাটক সম্বন্ধে এই বিশেষ উক্তি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কাব্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর সত্য। ভারতীয় সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন ঋগবেদে অরণ্যপ্রকৃতি ও মানবজীবনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় আছে। রামায়ণে রামসীতার বনবাসের সহচর অরণ্যপ্রকৃতির অন্তরঙ্গতাও বিশেষভাবে সার্থক। প্রকৃতিকে যদি অচেতন করে অঙ্কিত করা হত তবে রামসীতার বনবাসের দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁদের চরিত্রের মহত্ত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠত সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতির সজীব সাহচর্য তাঁদের চরিত্রের অন্য একটি দিক্ বিকশিত করে তুলেছে। এই সাহচর্য রামসীতার সুখ দুঃখ কঠোরতা ও আনন্দকে এক বিশালতার মধ্যে মুক্তি দিয়েছে। তাঁদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের বেদনার গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁরা সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে যেন যুক্ত হয়েছিলেন। অরণ্যও পেয়েছিল মানুষের

১ প্রাচীনসাহিত্য, শকুন্তলা।

প্রেম। সে প্রেম গভীর অরণ্যের নিঃসঙ্গ গাম্ভীর্য ও রহস্যময়তাকে নূতন চেতনায় ভরে তুলেছিল। এই নিবিড় যোগাযোগের ফলেই সীতাহরণের পর রাম অরণ্যকে তাঁর বিরহের সাথিরূপে পেয়েছিলেন, আর অরণ্য অনুভব করেছিল প্রিয়জনবিয়োগব্যথিত হৃদয়ের সবটুকু বেদনা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Pathetic falacy অলংকারের সাহায্যে মানবমনের বেদনাকে প্রকৃতিতে সঞ্চারিত করে দেওয়ার যে রীতি আছে, রামায়ণে সমবেদনাপরায়ণ অরণ্য-বর্ণনায় সে রীতির পরিচয় নেই। এ সমানুভূতি আরও গভীর, প্রকৃতির সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা আরও নিবিড়, অরণ্যের বেদনার অনুভূতি শুধু আলংকারিক অশ্রুপাতে সমাপ্ত নয়। মানুষ তার সমস্ত সত্তা দিয়ে নিজের জীবনের বিবিধ-লীলায় অরণ্যপ্রকৃতিকে যে বন্ধুত্ব দান করেছিল, এ সহানুভূতি এ অশ্রুপাত সে বন্ধুত্বের গভীরতা থেকে উদ্‌গত। আলংকারিক রীতি এখানে প্রাধান্য পায়নি।

রামায়ণ ও কালিদাসের কাব্যে যুগোপযোগী অনেক প্রভেদ রয়েছে, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও সে প্রভেদের পরিচয় আছে, কিন্তু মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির এই সরল অন্তরঙ্গতা বর্ণনায় সবগুলো কাব্যই একাত্ম। শকুন্তলানাটকের কথা আমরা আলোচনা করেছি। শকুন্তলার চরিত্র-চিত্রণে তথা কাহিনীর বিকাশে তপোবনপ্রকৃতির অচ্ছেদ্য সাহচর্য এই কাব্যকে অমর করে রেখেছে। মেঘদূত কাব্যেও মেঘকে দৌত্যকার্যে নিয়োগ এবং তার গমনপথের সঙ্গে নিখিলকে আনন্দ-বেদনার সম্বন্ধে যুক্ত করে দেওয়ার পশ্চাতে এই একই মনোভাব, একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। মেঘ পথে পথে জনপদবধূদের পিপাসু স্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে, দশার্ণদেশের উদ্যানকেতকীর দেহে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে শ্রান্তি অপনোদন করে, বেত্রবতী নদীকে বারিধারাপাতে স্নিগ্ধতায় ভরে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক উপাদানকে মানুষের মতোই চেতনার অধিকারী বলে অনুভব না করলে বিশ্বমানবের সঙ্গে তাকে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হত না। এখানেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মেঘকে মানবসুলভ অনুভূতিতে সজীব করে তোলার পথে কোনো আলংকারিক রীতির আশ্রয় নেওয়া হয়নি। রূপকের সাহায্য না নিয়ে একটি বিশেষ প্রাকৃতিক

উপাদানকে কোনো বিচিত্র দৃশ্যসংস্থানপূর্ণ একখানি কাব্যের নায়কত্ব দান, এ বোধ হয় আর কোনো দেশের সাহিত্যে সম্ভব হয়নি। কুমারসম্ভব কাব্যের সূচনাতেই আছে হিমালয়ের বর্ণনা।

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়োনিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

—কুমারসম্ভব ১।১

তারপর শ্লোকের পর শ্লোক চলেছে হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্পদ্ বর্ণনায়। এই 'আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতঃ' হিমালয়কে কবি মেনকার স্বামী এবং পার্বতীর পিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে তবুও একটা প্রচ্ছন্ন Personification বা সমাসোক্তির কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী অংশে হিমালয়ের অঙ্গেই তপস্যারত শংকরের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে মদনভস্মের দৃশ্যে এবং রুদ্ররোষে ভীত হয়ে যখন পার্বতী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা
দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ॥

—কুমারসম্ভব ৩।৭৬

পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর মানদণ্ড হিমালয়ের অকস্মাৎ রূপপরিবর্তন করে হস্তপদযুক্ত সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে অসংগতি আছে। কিন্তু এই অসংগতি কবিকে কিংবা তাঁর কোনো পাঠককে কোনোদিন পীড়া দেয়নি। প্রকৃতিকে প্রকৃতি রেখেই ভারতবাসী চিরকাল তাকে মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলেই ভেবেছে, তাই এই কল্পনা তাদের চোখে কখনও অসংগত বলে ঠেকে নি। ভবভূতির উত্তররামচরিত কাব্যেও দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশেষত্বটি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বনবাসে রামসীতার প্রেম ও আনন্দ পরিপূর্ণতার মাত্রা ছাপিয়ে প্রতিবেশী প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে।

সীতাহরণের দুঃখে তাই অরণ্যপ্রকৃতিরও অংশ আছে। মোট কথা, ভারতীয় কবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যতীর্থগুলি পরিভ্রমণ করলে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই সাধারণ বিশিষ্টতাটুকু অত্যন্ত অসাবধানী পাঠকেরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

পরিবেশ

রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় ভারতীয় চিত্তের এই বৈশিষ্ট্য সযত্নে বিচার করার বিশেষ সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ অনুভূতিশীল মন নিয়ে জন্মেছিলেন একথা সত্যি। বহিঃপ্রকৃতির আহ্বানে তাঁর শিশুমন সাড়া দিয়েছিল অন্তর্নিহিত প্রেরণায়। সে কথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বহুবার উল্লেখ করেছেন। 'আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির বাহিরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্মাল ইস্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে— মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে অনাবৃত হইয়া গেল— সেই মুহূর্তের কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত, এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত'।[১] প্রভাতসংগীত-এর পুনর্মিলন কবিতায় এবং পরবর্তী কালের আরও অনেক কবিতায় কবি প্রকৃতির সঙ্গে তার আশৈশব নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেছেন। এই অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে লালন করে পরিপূর্ণতা দান করেছিল তাঁর পরিবেশ। বাল্যকাল থেকেই উপনিষদের সংস্কৃতির মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন

১ জীবনস্মৃতি, প্রভাতসংগীত।

ভারতীয় কবিদের কাব্য আস্বাদনের জন্য যে অনুকূল আবহাওয়া প্রয়োজন তাও তাঁর পরিবারের মধ্যেই বর্তমান ছিল। এই অনুকূল পরিবেশের থেকে প্রেরণা আহরণ করে তাঁর অন্তরনিহিত প্রতিভা পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছিল। সত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলেছেন, 'আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক'।[১] অত্যন্ত বাল্যকালেই একদা মেঘোদয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে মেঘদূত আবৃত্তি শুনে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ছাপ পড়েছিল তার কথা তিনি জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠায় বিবৃত করেছেন। আর একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক তাঁর শিশুচিত্তকে মাতিয়ে তুলেছিল। কবি বিহারীলালের কাছেও বাল্মীকি এবং কালিদাসের কবিত্বশক্তির পরিচয়লাভের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকথা থেকে এ তথ্যটুকু সংগ্রহ কঠিন নয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের থেকে প্রেরণা লাভের সুযোগ তাঁর পরিবেশ তাঁকে উপযুক্ত পরিমাণেই দিয়েছিল। আপনার সহজাত প্রতিভায় সে সুযোগ তিনি পরিপূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও প্রাচীন এবং প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পথে তিনি প্রচুর সহায়তা লাভ করেছিলেন। তার কোনটি কি ভাবে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল সেকথা যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। এখন এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অসাধারণ অনুভূতিশীল মন নিয়ে এবং যে সংস্কারের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে মন এবং সংস্কারকে বিশেষ-ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর আবাল্যপরিচয়।

[১] আত্মপরিচয়, পৃ ৮৬।

২

যুগধর্মও তাঁর মানসসত্তাকে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। যে-যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-যুগ বাংলাসাহিত্যের সন্ধিযুগ। চিরাচরিত রীতিতে সাহিত্যরচনার প্রতিক্রিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নবআবিষ্কৃত বৈভব তখন বাংলাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। প্রাচীন ভারতীয় মননধারার উত্তরাধিকার তাঁরই জীবনে ও সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই নববৈভবের সঙ্গে মিলিত হয়ে নূতন সার্থকতায় রূপ নিল। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের পথও তাঁর পক্ষে দুর্গম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর পরিবারের ভারতীয় সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়'।[১] এই নিবিড় আনন্দ উপভোগের মহলে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ চিত্তেরও ডাক পড়েছিল অতি শিশুকাল থেকেই। পরবর্তী কালে আমেদাবাদ প্রবাসের সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করতে আরম্ভ করেন। বিলাতেও কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট তাঁর ইংরেজি সাহিত্য পড়বার সুযোগ হয়েছিল। ইংরেজি সাহিত্যের রসসম্ভোগ এবং তার মধ্যেকার আনন্দটিকেও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাই প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইংরেজ কবিদের তথা আধুনিক মনের প্রভাব দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের সঙ্গে ইংরেজ কবিদের প্রকৃতি উপভোগের রীতি এবং তজ্জাত আনন্দের মূলগত প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরেজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক, আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, একপ্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরেজ প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে

১ আত্মপরিচয়, পৃ ৮৭।

আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্ম আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই'। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলি সাধারণভাবে মেনে নিয়ে এ কথা বলা চলে যে আধুনিক কালে প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্য সন্ধানের প্রয়াস, প্রকৃতিকে উপভোগের মধ্যে যে বৈচিত্র্যের পরিচয় আমাদের সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে, তার মূল উৎস হয়তো পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকেই উদ্ভূত।

৩

প্রকৃতির মধ্যে এই রহস্য সন্ধানের প্রচেষ্টা এবং প্রকৃতিকে উপভোগের বৈচিত্র্য আধুনিক কালেরই আবিষ্কার। মানুষ যতদিন প্রকৃতির অঙ্কে বাস করেছে ততদিন প্রকৃতিকে সে ভালোবেসেছে একটি শিশুসুলভ আকর্ষণে। প্রকৃতি যতদিন মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল ততদিন তাকে রহস্যমণ্ডিত করে দেখার কোনো প্রয়োজন ঘটেনি। প্রকৃতির সান্নিধ্যস্পর্শকে মানুষ যখন থেকে সভ্যতার নূতন নূতন আবরণে আড়াল করতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যতদিন প্রকৃতির সমস্তটাই মানুষের চোখের সামনে ছিল ততদিন তার নিরাবরণ রূপটি দেখবার জন্য মানুষের মনে কোনো আকুলতা জন্মেনি; প্রকৃতির রূপের মধ্যে কোনো ফাঁককে কল্পনায় পূর্ণ করে নেবার প্রয়োজনও ঘটেনি। ব্যবধান যতই বেড়েছে ততই প্রকৃতিকে চেনবার উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে উঠেছে প্রবল হয়ে। অন্তরালবর্তিনী প্রকৃতির যতটুকু চোখে পড়েনি ততটুকু সে কল্পনা করে নিয়েছে। আড়াল থেকে প্রকৃতি তার সঙ্গে কথা বলেছে আভাসে ইঙ্গিতে, প্রকৃতির মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে অসীম রহস্য অনন্ত সম্ভাবনা।

১ পঞ্চভূত, সৌন্দর্যের সম্বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনা কাব্যের প্রকাশ কবিতায় এই ভাবটিকে সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন। মানুষ যখন প্রকৃতির অঙ্কনিবাসী সেদিন প্রকৃতির কবি—

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবা নিশি,
লতা পাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি।
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলেন বলে প্রকৃতির মধ্যে কোনো অর্থ সন্ধানের চেষ্টা কবি করেননি, প্রকৃতিও তাই তাঁর সমস্ত সম্পদ্ নিয়ে তাঁর চোখের সামনেই ছিল।

বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিলনাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে।···
শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত এজন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে।
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতী লতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মর কথা।

কিন্তু একদিন প্রকৃতির রহস্য তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল, তিনি পৃথিবীর লোকের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিলেন।

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনো দিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
মধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে;

মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা ?

এই যে অপরিচয়ের রহস্যের সঙ্গে মিশিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগের ব্যাকুলতা, এই যে সমাধানহীন রহস্য সন্ধানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা, এটা বিশেষ করেই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি। একটা রোমান্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের পরিচয় আমাদের সাহিত্যে ছিল না। তার কারণ আছে। আমাদের দেশীয় কবিদের চোখে যে রহস্যটা বড়ো হয়ে উঠেছিল সেটা হল নিখিল বিশ্ব তথা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানবজীবনের যোগসূত্র। তাঁরা এই যোগসূত্রটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ধারণার উত্তরাধিকার বহন করছিলেন তাকে কোনোদিন অবিশ্বাস করেননি, তাই নূতন করে প্রকৃতির রহস্যসন্ধানের প্রচেষ্টাও করেননি। প্রকৃতির প্রতি তাঁদের ধারণায় জগৎ, জীবন এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এক মিষ্টিক দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন কবি তাঁদের কাব্যে প্রকৃতির বিষয়ে স্বকীয়তা দেখাননি তা নয়, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের একাত্মতা ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপ গ্রহণের আর একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রকৃতির সঙ্গে যে দূরত্বটুকু তার মধ্যে অপরিচয়ের রহস্য আবিষ্কারে সাহায্য করে, ভারতীয় জীবনে সে-দূরত্ব কখনই আসেনি। নাগরিক সভ্যতা ভারতবর্ষে ছিল না এমন নয়, কিন্তু নগরই তার সভ্যতার মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রকৃতির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগের সম্পর্ক ছিল পাশ্চাত্ত্য জীবনের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বদেবতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের স্বীকৃতি তাকে যে মিষ্টিক দৃষ্টির সংস্কার দিয়েছিল, সে সংস্কার তাকে নগরেও প্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে দেয়নি। পাশ্চাত্ত্য মনে সে সংস্কার ছিল না বলেই ও-দেশের কবিরা প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার নূতনত্ব উপভোগ করতে পেরেছেন।

৪

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের আদর্শে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য ধারার মিলন ঘটেছিল। প্রকৃতিকে অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত করে তার মধ্যে গভীরতর অর্থের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্ত শেষ পর্যন্ত এই সকল রহস্যকে এক বিরাট্ পুরুষের লীলাবৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বসৃষ্টির বিশালতার মধ্যে তাকে অনুভব করেছে। অতি শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির মধ্যে তিনি একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে রহস্য চেনা অচেনায় মেশা রোমান্টিক আনন্দে পূর্ণ। তাঁর নিজের ভাষায়ই বলি—

বাড়ির বাহিরে যাওয়া আমাদের বারণ ছিল, এমনকি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপশব্দগন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁকফুকর দিয়া এদিক্ ওদিক্ হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্যে প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।[১]

ছেলেবেলায় প্রকৃতির সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ না পাওয়াতে প্রকৃতিকে জানবার উপলব্ধি করবার যে আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসেছিল সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জীবনে কখনো ঘটেনি। প্রথম থেকে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠলে হয়তো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এরকম রূপ নিত না, কারণ উপকরণ যেখানে যত প্রচুর মনের আলস্যের সম্ভাবনা সেখানে তত বেশি। বাইরের সংস্রব দুর্লভ ছিল বলেই বাইরের আনন্দটা তাঁর জীবনে ছিল প্রবল। ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল বলেই প্রকৃতি শিশু-রবীন্দ্রনাথের চোখে রহস্যময় হয়ে উঠেছিল—

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি

১ জীবনস্মৃতি, ঘর ও বাহির।

অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই; এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বল দেখি, কোনটা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।[১]

এই রহস্যময় দৃষ্টির মায়া পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের ক্ষণটিতেও তাঁর চোখে লেগেছিল। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে পরিবারের শাসনমুক্ত কবি বাল্যকালের প্রকৃতির সহিত ব্যবধানের কথা স্মরণ করে লিখেছেন, 'আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনও দূরে, বাহির এখনও বাহিরেই'।[১] সম্পূর্ণ পরিচয় আর অপরিচয়ের মধ্যে এই মায়াময় ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো অনুভূতিকে একঘেয়ে হয়ে উঠতে দেয়নি। নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগে তিনি সৃষ্টি উপভোগের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার পদপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। প্রকৃতি সেখানে স্বতন্ত্র উপভোগের বস্তু নয়, অনন্ত রহস্যময়ের বিচিত্র রহস্য উপলব্ধির অন্যতম সোপান। এই ভাগবত অনুভূতির মধ্যেই আমরা কবি-সাধকের শেষ আশ্রয়, তাঁর উপলব্ধির চরম পরিণতি বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু পূরবী-মহুয়ার যুগে কবি নবীন উপলব্ধির ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের সামনে আবার আবির্ভূত হলেন। দেখতে পাওয়া গেল প্রকৃতির স্বকীয় রহস্যের মহলে তাঁর আমন্ত্রণ তখনও শেষ হয়নি, যৌবনের বসন্ত দিনের উচ্ছল আনন্দে যে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, বার্ধক্যের প্রগাঢ় উপলব্ধিতে আবার তিনি তাকে নূতন করে উপভোগ করলেন।

মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকোচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে
নীরবে লভিব তারে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে।

—পূরবী, লীলাসঙ্গিনী

১ জীবনস্মৃতি, ঘর ও বাহির।

জীবনের শেষপ্রান্তে মৃত্যুর পদধ্বনির মধ্যেও কবির সে রহস্যের আস্বাদন ব্যাহত হয়নি। সদ্যরোগমুক্ত কবির জীবনে শরৎ আবার অফুরন্ত বিস্ময় বয়ে নিয়ে এসেছে।

চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যেহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।...
তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচাল সে; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল; কালো তার চুল
পশ্চিম দিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।

—প্রান্তিক, ১৫

জীবনের সন্ধ্যাদীপের আলোকেও এই বিশ্বের সৌন্দর্যের মহল কবির চোখে অরূপের আলোর আভাস তুলে ধরছে, কিন্তু সবটুকু জানতে না পারায় তার রহস্যের আবেদন ফুরায়নি।

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা;
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃতপাত্রে ঢাকা;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা॥

—সেঁজুতি, পত্রোত্তর

লীলাসঙ্গিনী প্রকৃতি একদা ঘন দুর্যোগের রাত্রে তাঁর কাছে যখন শেষ অভিসারে এসেছেন, অতীত পরিচয়ের স্মৃতির সঙ্গে তখনও তিনি অনাগত বিস্ময়ও বয়ে এনেছেন। তার মুখে নূতনের অপরিচিত ইঙ্গিত।

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভ প্রান্তে আর একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন।
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা।
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীম বিস্ময়ে মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে সৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আজ আসিয়াছ তুমি, ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা।
কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

—সানাই, শেষ অভিসার

জীবনের প্রায় অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও প্রকৃতির গোপন থালিটিতে কবির জন্য কৌতূহলের উপচার সাজানো ছিল। প্রতিবেশী তরুর মর্মরে সূর্যের নূতন আলোকে কবি আকণ্ঠ পান করেছেন নূতন সুষমা।

খুলে দাও দ্বার;
নীলাকাশ করো অবারিত;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;

আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও।

—রোগশয্যায়, ২৭

জীবনের পর্বে পর্বে এই উপলব্ধির বৈচিত্র্য এই রহস্য আস্বাদনের নূতনত্ব তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনকে যেমনি, তাঁর প্রকৃতিপ্রেমকেও তেমনি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। প্রকৃতির প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে বিশালতা, আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যে আছে বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথে বিশালতার সঙ্গে বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমাবেশ। বিশালতার বিস্ময় আর বৈচিত্র্যের বিস্ময় তাঁর কাব্যে পেয়েছে নূতন সমন্বয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মিলন ঘটেছিল একথা যত বড়ো সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের স্বকীয়তা। তাঁর কাব্যসাধনার এই দিক্‌টিতে আমরা পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির প্রভাব সম্বন্ধে যত দীর্ঘ মন্তব্যই করি না কেন, এই সমস্ত প্রভাবের উপরে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাশ্চাত্ত্য উপভোগের রীতি শুধু তাঁর প্রকৃতিপ্রেমকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। তাতে তাঁর দেখার মৌলিকত্ব বা উপলব্ধির স্বকীয়তা খর্ব হয়নি। এই দুটি ধারার সংমিশ্রণের পরিচয় বহন করেও তাঁর প্রকৃতিপ্রেম এ দুএরই চেয়ে ভিন্ন। এ ভিন্নতাটুকু লক্ষ্য না করলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপটি বোঝা যাবে না। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিকে বলা চলে অদ্বৈতবাদী। প্রকৃতি এবং মানুষ সৃষ্টিকর্তারই প্রকাশ বা প্রতিরূপ। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে উভয়ের অভিন্নতাই উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ অনুভবের কারণ। মানুষ এবং প্রকৃতি স্বরূপত অভিন্ন বলেই তাদের এই অন্তরঙ্গতা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি এবং মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ততটা নেই যতটা আছে তাদের একাত্মতার প্রতি

ইঙ্গিত। কিন্তু এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য, বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যে দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে তাকে বলা চলে দ্বৈতবাদী দৃষ্টি। প্রকৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ—ভিন্নজাতীয় সত্তার সঙ্গে আকর্ষণ। প্রকৃতি ভগবানের লীলাবৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি অথবা মানুষ এবং প্রকৃতি গভীর সম্পর্কে যুক্ত, এধরনের কথা পাশ্চাত্ত্য দর্শন অথবা সাহিত্যে কোথাও নেই একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবি যখন প্রকৃতিকে উপভোগ করেছেন তখন তাকে স্বতন্ত্র সত্তা রূপেই জেনেছেন। ওআর্ডস্‌ওআর্থ প্রভৃতি যে পাশ্চাত্ত্য কবিগণ প্রকৃতির প্রতি মিষ্টিক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁদের মিষ্টিসিজমও প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁরা একটি সংগতি এবং সুষমা আবিষ্কার করেছেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে একটি সজীব সত্তার উপস্থিতির সন্ধান তাঁদের দৃষ্টিকে রহস্যময় করে তুলেছে, কিন্তু ভারতীয়দের মতো সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকৃতি মানুষ ও সৃষ্টিকর্তাকে একই যোগসূত্রে যুক্ত করে তুলতে পারেননি। প্রকৃতি স্বরূপে থেকেই তাঁদের আনন্দ দিয়েছে, বিশ্বস্রষ্টার বিরাট্ সত্তার প্রকাশ বলে নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এই দুএর চেয়েই স্বরূপত ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব দর্শনের ভাষায় বলা চলে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভেদকেও তিনি উপেক্ষা করেননি, তাদের অভিন্নতাও তাঁর কাব্যজীবনের প্রতিপর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। এই মিষ্টিক বা অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ উভয়ের যোগে তাঁর কাব্য নূতন রূপ নিয়েছে। প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রূপে কল্পনা করে তিনি তাকে যেমন উপভোগ করেছেন, বিশ্বসৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে স্থাপন করেও তেমনি তাকে উপলব্ধি করেছেন। দুটোর কোনটাই তাঁর কাছে কম সত্য নয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বকীয়তা তাঁকে অন্য সকল কবির থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় কবিদের সঙ্গে তাঁর আর-একটি প্রভেদ হচ্ছে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের একটি নূতনতম বৈশিষ্ট্যে। আধুনিক কাব্য প্রধানত লিরিক বা গীতিধর্মী। স্বল্প পরিসরের মধ্যে আপনার অন্তরের রসঘন প্রকাশই গীতিকবিতার মূল কথা। প্রাচীন কাব্যে কবিপ্রাণের এই অনুভূতির প্রকাশটি নানা আখ্যান বা উপাখ্যানের অন্তরালে গৌণ হয়ে থাকত। কবির সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার মধ্যস্থতায় কবিকে আপনার অন্তরের কথাটি পাঠকমনে সঞ্চারিত করতে হত। পাঠকের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সম্পর্ক স্থাপিত হত না। বাংলার বৈষ্ণবকবিতাগুলি কবিসাধকদের ধর্মানুভূতির প্রকাশ, তাই এগুলিও গীতিকবিতা। কিন্তু এই অনুভূতির প্রকাশে একটি রূপক-কাহিনীর অন্তরাল রয়েছে। প্রকৃতির রূপপরিবর্তন প্রেমমুগ্ধা রাধার অন্তরে কি প্রতিক্রিয়া তুলছে, সেটাই তাঁদের বর্ণনীয় বিষয়। যদিও এ বর্ণনার মধ্য থেকে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের স্বকীয় দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়, তবুও সে পরিচয় আসে একটি উপাখ্যানের মধ্যস্থতায়। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ আধুনিক গীতিকবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। শক্তিশালী প্রাচীন কবিদের কাব্যে অবশ্য কাহিনী এবং উপাখ্যানের অন্তরাল ছিন্ন করে বহু স্থলে কবির হৃদয়টি আমাদের অনুভূতির মধ্যে অবারিত হয়ে পড়ে। বর্ষার প্রথম মেঘ একটি বিরহী চিত্তে মিলন আকাঙ্ক্ষার কি বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল, তাই হল কালিদাসের মেঘদূতের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু কাহিনী কিছুদূর অগ্রসর হতেই বিরহী যক্ষকে কবি বলে চিনে নিতে ভ্রম হয় না। বৈষ্ণব কাব্যেও রাধাকৃষ্ণলীলার উপাখ্যানগৌরব ছাপিয়ে কবিহৃদয়ের ধর্মব্যাকুলতার আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাকুলতা একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর ব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত পরিচয় এর মধ্যে ক্ষীণ। আত্মকেন্দ্রিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে কবির সঙ্গে বৃহৎ বিশ্বজীবনের বৃহত্তর সম্পর্ক, সবই গীতিকবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে। প্রাচীন গীতিধর্মী কাব্যে এবং গীতিকাব্যে ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম অনুভূতির চেয়ে ব্যাপক বৃহত্তর জীবনের অনুভূতিটাই বেশি করে

প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকও নিভৃত গৃহে কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে একাকী এসে কবির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতেন না, রাজসভায় অথবা গানের আসরে বহু শ্রোতার মধ্যে তাঁকে কবির সঙ্গ লাভ করতে হত। সুতরাং আত্মকেন্দ্রিক জীবনে প্রকৃতি-সহচরীর স্পর্শের প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় আধুনিক কবি পাঠকের কাছে যতটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন, প্রাচীন কবিদের পক্ষে তার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অল্প পূর্বে হয়তো পাশ্চাত্ত্য কবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে আধুনিক গীতিকবিতার এই উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বটি বাংলা কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই বিশেষত্বটি চরম সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন কবিরা মানবের সঙ্গে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য গভীর সম্বন্ধের কথা বলেছেন মানবসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সে সম্বন্ধ ব্যক্তিগত পরিচয়ের নিবিড়তায় বিশেষভাবে সত্য।

৩

কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল কবির চেয়ে প্রকৃতিপ্রেমের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের যে প্রভেদটা সবচেয়ে বড়ো সেটা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উপলব্ধির গভীরতায়। প্রকৃতিগত বিচারে উভয় দেশের কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য থাকলেও পরিমাণগত পরিচয়েও তিনি অসাধারণ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকারভেদে ততটা নয় যতটা পরিমাণভেদে। শকুন্তলাকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আলাদা করে ভাবা দুঃসাধ্য, ভাবের আদান-প্রদানে তারা অচ্ছেদ্য, উভয়ের অন্তরের সৌন্দর্যটুকু উভয়কে অনুরঞ্জিত করেছে। কিন্তু একজন নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে অন্যের মধ্যে মিশে যেতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমে সে আত্মবিলুপ্তিও আছে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে তিনি প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে মিশে ছিলেন। সেই একাত্ম অস্তিত্বের আনন্দ এবং সুদূর বিস্ময় আজও তাঁর স্মৃতিতে জড়ানো। মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বসলে সেই স্মৃতির সৌরভটুকু তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে। সমস্ত পৃথিবীর তৃণ-লতায় পরিব্যাপ্ত তাঁর সেই আদিম প্রাণের আনন্দরসটি বর্তমান বিচ্ছেদের বেদনার সঙ্গে মিলে এক বিচিত্র ঐক্যতান বাজাতে থাকে।

একসময়ে আমি যখন এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত— আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোক আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।

—ছিন্নপত্র, পত্রধারা, পৃ ১৬৩

আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিলনা, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে,— তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব-শিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব-নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।

—ছিন্নপত্র, পত্রধারা, পৃ ১৭০

এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল,আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়।

—ছিন্নপত্র, পত্রধারা, পৃ ১৯১

আদিম প্রকৃতির মধ্যে আপনার সমস্ত সত্তার পরিব্যাপ্তির অনুভূতি আর কোনো ও কবির চিত্তে এমন স্পষ্ট করে জাগেনি। প্রকৃতির নাড়ীর টান তার ধাত্রীত্বের স্মৃতি অন্য কবির মধ্যে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘাসের শ্যামলতায় আপনার আনন্দকে ছড়িয়ে দিয়ে, নারকেল গাছের জীবনোচ্ছ্বাসের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আপনার অনুভূতিকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে যুগে যুগে নূতন জীবনে আর কোনো কবি প্রকৃতির সঙ্গে এই নিবিড় এবং সূক্ষ্ম মিলনের স্মৃতি উপভোগ করেননি। প্রেমের পরিমাণ তথা গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ এখানে সকল কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাব্যজীবনের পর্বে পর্বে প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর মিলনের পরিচয় আছে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফলগন্ধরেণু;তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি

সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর।

—সোনারতরী, বসুন্ধরা

সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কবি অতীতের সেই নিবিড় মিলন অনুভব করেছেন। তাঁরই বক্ষে যেমন পুষ্প ঝরে পড়েছে তৃণাঙ্কুর শিহরিত হয়ে উঠেছে, তেমনি সমুদ্রের তরঙ্গস্পন্দনেও তাঁর আদিম জীবনস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে।

মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে,— লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃ হৃদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

—সোনার তরী, সমুদ্রের প্রতি

কোনো মধ্যাহ্নে গ্রাম্য দৃশ্যের সুষুপ্ত শান্তিরাশির মধ্যে প্রবাসযাপনের সময়ও তাঁর মনে প্রবাসের দুঃখ বাজেনি, শান্ত প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের সঙ্গে তাঁর অতি পুরাতন আত্মীয়তা তাঁর সে দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে।

প্রবাস-বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে ;
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহু কাল পরে,— ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে

পূর্বজন্মে,— জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে— মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

—চৈতালি, মধ্যাহ্ন

সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এই নিবিড় আত্মীয়তার উল্লাস বার বার তাঁর মনের দুয়ারে এসে ভিড় করেছে।

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

—উৎসর্গ, ১৪

সৃষ্টির আদিম যুগের এই নিবিড় সঙ্গ তাঁর দেহে কুসুমের সুবাস দিয়েছে, প্রভাতআলোর হাসির আভাটুকু তাঁর আনন্দ থেকে আজও মিলিয়ে যায়নি, প্রকৃতির আনন্দের সৌন্দর্যের স্পর্শ আজও তাঁর সমস্ত সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর চোখে এখনও লেগে আছে শারদ ধান্যের শ্যামল আভাস।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।

—উৎসর্গ, ২১

শুধু অতীত জীবনে প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকার স্মৃতিই তাঁর সমস্ত চেতনাকে অধিকার করেছে এমন নয়, বর্তমানের এই বিচ্ছেদের মধ্যে বসে তিনি প্রকৃতির অঙ্গে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দও অনুভব করেছেন।

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব মাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে,...

আমার আনন্দ লয়ে
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাতআলোক মাঝে হবেনা সঞ্চার
নবীন কিরণ-কম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে— যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা,— প্রেমিকের দুনয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান ।

—সোনার তরী, বসুন্ধরা

নূতন নূতন জন্ম পরিক্রমণের সঞ্চিত আনন্দ দিয়ে প্রকৃতিকে এরকম করে অনুরঞ্জিত করে দেওয়ার কল্পনা আর কোনো কবি করেননি। কল্পনার এই বৈভবে, অনুভূতির এই গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবিদের বহু পশ্চাতে ফেলে এসেছেন। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ্ আহরণের ক্ষেত্রেও যেমনি, আপনার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে প্রকৃতিকে উপহার দেবার বেলাও তেমনি তাঁর চিত্তের এই ব্যাপ্তি আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আপনার আনন্দ আপনার প্রেম দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির মহলে মহলে নূতন বিকাশের বর্ণ এঁকে দেওয়ার আনন্দ তিনি বহুবার উপলব্ধি করেছেন ।

প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে

বাহিরে আসিবে ছুটি, অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
—উৎসর্গ, ৪৬

প্রেমের এই সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধি, অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকার স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে অন্যান্য প্রকৃতি-কবিদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

প্রকৃতির শান্তরূপ

কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে সেক্‌সপীয়রের টেম্পেস্ট-নাটকের তুলনা-প্রসঙ্গে এই দুটির ভাবগত বৈশাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকগুলির বহিঃপ্রকৃতির রূপের মধ্যে গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। 'টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ।···টেম্পেস্ট-নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপার ও সেইরূপ। মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ।···বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির মধ্যে তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই।··· টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি, টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান'।[১] প্রকৃতির শান্তরূপের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ উক্তিগুলির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যসাধনায়ও এই আকর্ষণের পরিচয় আছে।

প্রকৃতির মধ্যে প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দের সঞ্চয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে শুধু বৈচিত্র্যই দেয়নি, এই সকলকে জড়িয়ে প্রকৃতির শান্ত রূপের উপলব্ধি

১ প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা।

তাঁর কাব্যকে বিরাট্ও করেছে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নেই তা নয়। ভৈরবরূপী প্রকৃতিও কবির কাব্য অসামান্য সফলতা লাভ করেছে। কিন্তু সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির অন্তস্তলে, অনন্ত রূপবৈচিত্র্যের মহানেপথ্যে বসে আছেন যে শান্তিরূপী সত্তা তিনিই কবিকল্পনার মূল উৎস্। তাঁর পদপ্রান্তে এসে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রূপের উপলব্ধিগুলি এক শান্তসংগীতে পরিসমাপ্ত হয়েছে। মৃত্যুর মধ্যেও তাই কবি এক মহাশান্তির সন্ধান লাভ করেছেন।

সমুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

—শেষ লেখা, ১

প্রকৃতিও সেই শান্তিরূপীর একটি প্রকাশ, তাই প্রকৃতিরও শান্তরূপটিই কবিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে বেশি করে। কল্পনাকাব্যে বৈশাখের একটি অনবদ্য রুদ্রমূর্তি আছে।

হে বৈশাখ, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর তব পিঙ্গল উড্ডীন জটাজাল,
মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক!

—কল্পনা, বৈশাখ

কিন্তু কবিতার উপসংহারে শান্তরসপ্রধান কবি বৈশাখকে শান্তিবারি সিঞ্চনে তাঁর হোমানল নিবিয়ে দিতে বলেছেন। প্রকৃতির শান্তিময় রূপটাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে বলেই, শান্ত শরৎকালের প্রকৃতি তাঁর কাব্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তাঁর কাব্যতীর্থ পরিক্রমণের সময় আমরা আমাদের উক্তির পরিপোষক উদাহরণ সংগ্রহ করব।

শান্ত প্রকৃতির মধ্যে কবি মননধারা বিকাশের অনুকূল এক আশ্চর্য লিখনের সন্ধান পেয়েছেন, কর্মকোলাহলের মুখরতা থেকে এই নীরব শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে গিয়ে কবি নিজেকে আর প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে শিখেছেন নূতন করে।

পৃথিবী যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শত-সহস্র নক্ষত্রের নিশঃব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারের এ যে কী এক প্রকাণ্ড মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন— আর এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত প্রান্তভাগ— এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা।

—ছিন্নপত্র, পত্রধারা, পৃ ৩১

যেখানে উচ্ছলতা যেখানে বর্ণ অথবা ধ্বনির সমারোহ সেখানে উপকরণের দ্বারাই মনটা অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই বিরলসমারোহ শান্ত প্রকৃতির মধ্যেই কবির পক্ষে বিরাটের উপলব্ধি সহজ হয়েছে। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য, এই শান্ত প্রকৃতির বিশালতার আভাসকে কবি 'পাঠশালা' বলেছেন। এখানে এলে যে সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য রূপটিই চোখে পড়ে তা নয়, মানবের অন্তর আর-একটি শিক্ষাও লাভ করে। আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে শুধু মানবের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখি বলে, সে উগ্র হয়ে উঠে কেবলি আপনাকে প্রচার করতে থাকে, নিজেকে ছাড়িয়ে মহত্তর কিছুর ইঙ্গিত দিতে পারে না। কিন্তু 'বিরাট্ প্রকৃতির মধ্যে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না'।[১] প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষও আপনার উগ্রতাকে শান্ত করে আপনার স্বাভাবিক স্থানটিকে আবিষ্কার করতে পারে, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে তার যোগসাধনের পথ সহজ হয়ে আসে, সৃষ্টিকর্তার লীলা বৈচিত্র্যটি সে আপনার মধ্যে পরিস্ফুট দেখতে পায়, তার আত্মার উপলব্ধি ঘটে।

যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব

১ শিক্ষা, তপোবন।

সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান, মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে।...এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে।

—শিক্ষা, তপোবন

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভারতীয় উপলব্ধির এই বিশেষ সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অনুভবের মধ্যে নিবিড় করে পেয়েছিলেন। তার অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যজীবনে বার বার ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু এই উপলব্ধি কেবলমাত্র তাঁর কাব্যজীবনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, তাঁর বাস্তব চিন্তাধারায়, তাঁর মানবসম্পর্কিত কর্ম-কুশলতার মধ্যেও একে তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। যন্ত্রযুগে স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের প্রকৃতির প্রতি নীরব ঔদাসীন্যের প্রতিক্রিয়াতে ইংরেজ কবি ওআর্ডস-ওআর্থের কাব্যেও প্রকৃতির পাঠশালাতে ফিরে যাবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর সে আহ্বান নিছক একটা কাব্যানুভূতির অভিব্যক্তি, তার মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টায় এই অনুভূতি বাস্তব রূপ নিয়েছিল। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃতির সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সে প্রয়োজনীয়তা যে কেবল প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে চোখের দেখায় আয়ত্ত করার জন্য তা নয়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যই তার প্রয়োজন। প্রকৃতির শান্ত সমাহিত মূর্তিটি তার জীবনের চারদিকে যে আনন্দময় অবকাশ রচনা করে দেয়, তা শিশু-চিত্তের পরিণতির পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল।

খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ-কথা বোধহয় কেজো লোকেরাও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা

বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিওনা।… শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় আকাশের মধ্যে দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল— সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।

—শিক্ষা, শিক্ষাসমস্যা

শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে প্রকৃতির সাহচর্যের কথা শুধু তাঁর মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিশ্বভারতীর শিক্ষাতীর্থে তিনি এই মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাশ বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায় পুরানো কথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে'।[১]

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ যেমন তপোবনের মধ্যে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকে শান্তসমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, আজও তেমনি শিক্ষার্থীরা শান্ত প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে থেকে তাদের বিকাশের পথ খুঁজে নেবে— এই উদ্দেশ্যেই তিনি বিশ্বভারতীতে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন। মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে উঠলে মানুষ কোনো বিষয়েই আপনার অহংকারের উগ্রতাকে প্রধান হয়ে উঠতে দেয় না, কোলাহলের মুখরতার মধ্যে আপনার অন্তরের চরম অভিব্যক্তির সন্ধান করে বেড়ায় না। মানুষের চারিত্রিক তথা মানসিক বিকাশে ঋতুচক্রের আবর্তনেরও একটা বিশেষ স্থান আছে। তাই শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে

১ শিক্ষা, শিক্ষাসমস্যা।

প্রত্যেক ঋতুর স্পর্শকেই উৎসবের দ্বারা অভিনন্দিত করে নেবার রীতি প্রচলিত। আমাদের লুপ্তপ্রায় ঋতুউৎসবগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ঋতুসৌন্দর্য উপলব্ধির ভিত্তিতে পুনঃপ্রচলিত করেছেন। চরিত্র ও মনের উপর বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবকে এরকম গভীর এবং সার্থক স্বীকৃতি আর কোনো প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কাব্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই। পরে যথাস্থানে আমরা রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য, ঋতুসংগীত এবং বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্পদের প্রতি তাঁর কবিদৃষ্টির পরিচয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। পরিমাণগত বিচারে তথা ভাবগত গভীরতায় ঋতুবর্ণনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তুলনাহীন।

কালিদাস, ওআর্ডসওআর্থ, শেলি, কীটস ও রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় কবিদের থেকে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন বিশেষ কবির সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমের বিচারে তাঁর সাদৃশ্য এবং বিভিন্নতা আলোচনা না করলে এপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের কবি। তপোবনজীবনের গাম্ভীর্য ও সংযম, প্রেমের উচ্ছলতাহীন গভীরতা, মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির শান্ত সহযোগিতা উভয়েরই কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে। কালিদাসের কাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমিও রবীন্দ্রনাথকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল বিশেষভাবে। তবু যুগধর্মের প্রভাবে এবং কবি-ধর্মের স্বাতন্ত্র্যে তাঁদের কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়ে গেছে। কালিদাস শান্তরসের কবি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আপাত শান্ত অনুভূতির মধ্যে একটু ব্যাকুলতার আভাস থেকে যায়। কালিদাসে কবিধর্মের প্রতীক হিমালয়ের শান্ত গাম্ভীর্য আর রবীন্দ্রনাথের পদ্মার বিচিত্র গতিশীলতা। প্রকৃতি উপভোগের মধ্যে এই গতিশীল ব্যাকুলতাই রবীন্দ্রনাথের কোনো উপলব্ধিকে চরম বলে স্বীকার করে নেয়নি।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে প্রধানত মানবজীবনেরই জয়গান। সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ দ্বন্দ্বের। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের যেটুকু সাফল্য, তারই মহিমায় তাদের সাহিত্য মুখর। টেম্পেস্ট ও শকুন্তলা নাটকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

টেম্পেস্ট-নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই— বিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

—প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা

কিন্তু আমাদের জীবনে এবং সাহিত্যে এই বিবোধ এবং দ্বন্দ্বের পরিচয় নেই। যেখানে প্রকৃতির কাছে আমাদের পদে পদে পরাজয় সেখানেও আমরা আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করে সেই পরাজয়ের গ্লানিকে প্রীতির সম্পর্কে পরিণত করেছি।

পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিলনা, পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় আমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাত শক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনই মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।··· মানুষ যে কেবল অগত্যা এইরূপ আত্মপ্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমরা কোনোরূপ অভিভূত নহি বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ সেখানেও আত্মীয়তা স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

—পঞ্চভূত, সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

এই উক্তিগুলি আমাদের জীবন এবং সাহিত্য সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সত্য। ওআর্ডসওআর্থ শেলি কীটস প্রভৃতি প্রকৃতিকবিদের কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা, তার উৎসমূলে একটা প্রতিক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় মন প্রকৃতির সহৃদয় সহযোগিতার সন্ধান পেয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য কবিদের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের তুলনায় একটি মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের উপভোগের রীতিতে এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে যে সাদৃশ্য আছে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ওআর্ডসওআর্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছি। প্রকৃতিকে দুজন কবিই আমাদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য মনে করতেন। ওআর্ডসওআর্থের পক্ষে অবশ্য এই বিশ্বাস একটা নূতন অনুভূতি মাত্র; কবিকল্পনার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে জীবনের ক্ষেত্রে তাকে বাস্তবতাদানের প্রয়াসে কবি উদ্‌বুদ্ধ হননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই বিশ্বাসের সংস্কার অতি স্বাভাবিক। এই বিশ্বাসকে কবিকল্পনা থেকে বাস্তবের কঠিন ক্ষেত্রেও তিনি নামিয়ে এনেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে ওআর্ডসওআর্থের সম্পর্কে আছে একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। শান্তি এবং মঙ্গলের বিগ্রহ রূপে তিনি প্রকৃতিকে পূজা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সহজাত সংস্কারের ফলেই প্রকৃতিকে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর প্রকৃতি ওআর্ডসওআর্থের মতো কেবল মঙ্গলদায়িনী ও শান্তিরূপিণীই নন। প্রেম সৌন্দর্য মঙ্গল শান্তি সব জড়িয়ে তার একটি বৃহৎ রূপ আছে। প্রকৃতির এই বৃহৎ রূপ কোনো ইংরেজ কবির কাব্যে নেই, ওআর্ডস-ওআর্থেরও ছিলনা।

৩

শেলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের একটা সাদৃশ্য ছিল, সেটা হল তাঁদের অনুভূতির মধ্যে একটা চিরচঞ্চল ব্যাকুলতা। শেলির নাতিদীর্ঘ কবিজীবনে এই ব্যাকুলতাই সবচেয়ে বড়ো কথা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কোনো একটা বিশেষ অনুভূতির পরিপূর্ণতার মধ্যে বুঝি কবি

এই ব্যাকুলতার সীমারেখা টেনে দেবেন, কিন্তু তা কখনও হয়নি। কবিধর্মের এই সাদৃশ্য দুই কবির উপভোগের রীতিতে সাদৃশ্য এনে দিয়েছে। চঞ্চল নদী, ঝটিকা, মেঘ, উদার আকাশ, আর সমুদ্রের বিপুল বৈচিত্র্য শেলির খুব প্রিয় ছিল। সমুদ্র অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে তেমন করে টানেনি, কিন্তু মেঘ, ঝড়, চঞ্চল নদী ও উদার আকাশ তাঁরও বড়ো প্রিয় ছিল। বিশেষ করে নদী ও আকাশের মধ্যে তিনি তাঁর কবিধর্মের সাদৃশ্য পেয়েছিলেন। নদীর গতি আর উদার আকাশের মধ্যে যে চঞ্চল ব্যাকুলতা আর সীমাহীনতা আছে, শেলি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তার উপাসক। বস্তুকে অতিক্রম করে ভাবের সাহায্যে প্রকৃতি-বর্ণনাও দুই কবিকে একসূত্রে বেঁধেছে। প্রকৃতির নিছক চিত্ররূপ এঁকে তোলার প্রচেষ্টা শেলির কাব্যে নেই। রবীন্দ্রনাথেও প্রকৃতির ভাবরূপটাই প্রধান, তবু চিত্ররূপ অঙ্কনের অসামান্য সাফল্যও তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে কীটসের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য আছে। কীটসের কাছে প্রকৃতি ছিল সৌন্দর্যের বিগ্রহ। সৌন্দর্যরূপী প্রকৃতি উপভোগের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পথে পথে ছড়ানো আছে। এক্ষেত্রে কীটস-সুলভ passionate অনুভূতিও তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে। উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিভিন্ন কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সাদৃশ্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে তা অপ্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম

কবিপ্রতিভার অবলম্বন হল প্রকৃতি, মানবজীবন এবং ভগবদ্‌ভক্তি। ব্যাপক ভাবে দেখতে গেলে কাব্যের বিষয়বস্তু এই ত্রিধারার একটিকে অথবা একাধিক ধারার সমন্বয়কে আশ্রয় করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই তিনটি ধারারই পরিচয় আছে। গভীর মিষ্টিক দৃষ্টি এই ত্রিধারারই মধ্যে সুন্দর সমন্বয়ের সুর এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে এই ত্রিধারার সমন্বয়ের কবি বলার চেয়ে প্রকৃতির কবি বলাই অধিকতর সংগত। প্রকৃতিলীলা ও উপভোগের আনন্দ তাঁর কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে

দেখাতে চেষ্টা করেছি কি করে প্রকৃতিকে উপভোগের মধ্য দিয়ে কবি মানবজীবনের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, ভগবানের স্পর্শও এসেছে তাঁর হৃদয়ে প্রকৃতির মধ্যস্থতায়। জীবনের কোনো এক পর্বে নারীপ্রেম তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা হয়ে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সে নারীপ্রেমের সৌরভকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি প্রকৃতির মধ্যে নারীর প্রেমমাধুর্য উপভোগ করেছেন। মানবজীবন সম্বন্ধে কবির সচেতনতা কোনো এক যুগে প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ তাঁর চোখে প্রকট করে তুলেছিল। কিন্তু পরে মানবের বেদনার সঙ্গে প্রকৃতিকে সহানুভূতিতে তিনি বেঁধে দিয়েছেন। যে অমোঘ নিয়মের ফলে মানবের জীবনে বেদনাময় পরিণতি ঘনিয়ে আসে, তার থেকে প্রকৃতিরও মুক্তি নেই। ভগবদ্‌ভক্তিও একযুগে কবিচিত্তকে অধিকার করেছিল, সে ভক্তিও প্রকৃতির স্পর্শলেশহীন নয়। কাব্যজীবনের পঞ্চমাঙ্কে কবি আবার প্রকৃতির স্বকীয় রহস্যের মহলে ফিরে এসেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবির চোখে তার আবেদন ফুরিয়ে যায়নি।

আয়তনের দিক্ থেকেও যেমন, গভীরতায়ও তেমনি প্রকৃতিই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। প্রকৃতির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার পরিচয় দিয়েছি। একটা কথা এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সৃষ্টির মূল উৎস হলেন বিশ্বদেবতা, এটি কবিজীবনের একটি গভীর উপলব্ধি। প্রকৃতি এবং মানুষ তাঁরই প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা, তার সঙ্গে একাত্মতার গভীর অনুভূতি কবির জীবনে কখনও আসেনি। তাঁর যত কাছেই তিনি গিয়ে থাকুন, নিজের অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়ার মতো মনোভাব তাঁর কখনও হয়নি। কিন্তু বিশ্বদেবতার প্রকাশস্বরূপ প্রকৃতির গভীরতায় তাঁর এইরকম আত্মবিলোপের পরিচয় আছে। ভগবদ্‌ভক্তি তাঁর কাব্যের প্রেরণা, কিন্তু প্রকৃতি তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমস্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপাসনা যাঁর চরণপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়, প্রকৃতির সঙ্গে কবিও তাঁরই চরণে অধ্যাত্মজীবনের নমস্কার পাঠিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় এই দূরত্বটুকু তাঁর ছিল না। আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে কবি প্রকৃতির দেহে নূতনতর বিকাশের বর্ণ এঁকে

দিয়েছেন। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাঁর কবিজীবনের আর কোনো আশ্রয় নেই। তাঁর জীবনের মূলপ্রেরণা ও তাঁর কবিসত্তার এই উপাদানটিকে আমরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে নূতন নূতন বিকাশের মধ্যে দেখবার প্রয়াসী হব।

প্রাক্‌রবীন্দ্র বাংলাকাব্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ধারাবাহিকতা এবং ক্রমবিকাশ রসজ্ঞ পাঠকের নিকট বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর রচনাগুলি বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্রহীন নয়, তাঁর কাব্য রচনার ধারা একটি সুসংগত ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যেও এই ধারাবাহিকতা এবং ক্রমপরিণতির পরিচয় আছে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর কাব্যসাধনার থেকে আমরা তার ইঙ্গিতটুকু আবিষ্কার করবার প্রয়াস পাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির স্থান নির্ণয় করতে গেলে তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাকাব্যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার। বাংলার প্রকৃতি-কাব্যের বিকাশের ধারার পটভূমিতে রবীন্দ্রকাব্যকে বিচার করলেই এই ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত নূতন পথ এবং তাঁর উদ্‌ভাবিত নূতন বিকাশের সম্ভাবনাগুলি আমাদের পক্ষে বুঝতে সহজ হবে।

বাংলাকাব্যের আদিযুগের রচনায় প্রকৃতির যে রূপ তা প্রায় সম্পূর্ণ-রূপেই সংস্কৃতসাহিত্যের অনুকরণপ্রচেষ্টার ফল। প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিদের আদর্শে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই প্রকৃতি গতানুগতিক হয়ে উঠেছিল। কতগুলি চিরাচরিত রীতি ও বহুব্যবহৃত ভঙ্গিতে কাব্যে তার অবতারণা করা হত। প্রকৃতিবর্ণনা এবং প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে রূপ-বর্ণনাও বিভিন্ন কবির স্বকীয়তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথমযুগের বাংলাসাহিত্যও এ-ক্ষেত্রে কোনো গৌরব করতে পারে না। একেবারে সূচনা থেকেই ধর্মকে সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য করে তোলাতে কাব্যে প্রাকৃতিক উপাদানকে প্রাধান্য দেবার সুযোগও বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি ছিল না। রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রই সে-যুগের অনেক কবির প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'বারমাসিয়া' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গতানুগতিক উপায়ে প্রকৃতিবর্ণনার অবতারণা করা হত। বৈষ্ণবকবিতায় অবশ্য প্রকৃতিদৃশ্য সন্নিবেশের সুযোগ এবং অবকাশ অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, কিন্তু সেখানেও

সেগুলি উপস্থিত হত নায়ক অথবা নায়িকার সুখদুঃখের নিয়ামক রূপে। তাদের বিরহ- ও মিলন-রজনীতে সহানুভূতিপূর্ণ বা নির্বিকার দৃষ্টি দান করেই তার কাজ শেষ হত। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে গভীর সম্পর্কের কথা রামায়ণ-শকুন্তলা-উত্তররামচরিতে স্থান পেয়েছে তার পরিচয় বাংলাসাহিত্যের সে-যুগে ক্ষীণ। অনেক সময় নায়কনায়িকাকে আরণ্য প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করে প্রাচীন কাব্যগুলির অনুকরণে প্রকৃতিকে মানুষের সহচরী করে তোলবার প্রয়াস আছে। কিন্তু কবির অনুভূতিতে সে প্রয়াসের সত্যতা নেই বলে তা ব্যর্থ হয়েছে। বৈষ্ণবকবিরা রাধাকৃষ্ণের রূপক প্রেমকাহিনী বর্ণনার জন্য একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। যমুনাতীর-কদম্বমূল এবং বর্ষা-বসন্তের পটভূমিতে দুটি কিশোর নায়কনায়িকার বিচিত্র প্রেমলীলা বর্ণনায় তাই অনেকখানি সরসতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বহুব্যবহারে এই পটভূমির সজীবতাও অল্পদিনের মধ্যে ম্লান হয়ে এল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অনেক কবি আধ্যাত্মিক প্রেমের পরিবর্তে পার্থিব প্রেমকে উপজীব্য করে গীত রচনা করেছিলেন। তাঁদেরও কাব্যে বৈষ্ণবকবিতার প্রাকৃতিক পটভূমি প্রায় মুদ্রাদোষের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। রূপবর্ণনার প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকেও বাংলার প্রাচীন কবিরা প্রকৃতিদৃশ্য থেকে আবিষ্কার করেননি, পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকে ধার করেছেন মাত্র। এক কথায় বলা চলে, প্রাগাধুনিক বাংলাকাব্যে প্রকৃতি প্রধানত পটভূমিরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে; আর বাংলার কবিদের স্বাভাবিক দৃষ্টি পূর্ববর্তী কবিদের সৃষ্ট প্রকৃতিচিত্রের অনুকরণপ্রয়াসে আচ্ছন্ন হয়েছিল। ইংরেজ-রাজত্বের ফলে নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় এবং খানিকটা নিজেরই গতানুগতিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার জন্য কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় বাংলাকাব্যে একটা নূতনত্বের সূচনা দেখা দিল।

২

প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু করে যে কাব্যরচনা করা যায় সে-কথা হয়তো ইংরেজ কবিদের দৃষ্টান্তেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই তার প্রথম পরিচয়। এ নূতনত্বটি অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাকাব্যে সুদূরপ্রসারী সফলতা লাভ করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরচনার আরএকটি

বিশেষত্ব হল তাঁর সংস্কারহীন দৃষ্টি। নিজের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তিনি চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। সাদা চোখে দেখা প্রকৃতির নিছক রূপটি তাই মাঝে মাঝে তাঁর কাব্যপ্রয়াসে ধরা পড়েছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যত বড়ো পথপ্রদর্শক ছিলেন তত বড়ো কবি ছিলেন না। তাঁর কাব্যে যে-সব নূতনত্বের ইঙ্গিত ছিল, অপরিণত কবিপ্রতিভার জন্য সেগুলি সফল হয়ে উঠতে পারেনি, অনুভূতির স্বল্পতা তাদের কবিত্বপূর্ণ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংলাকাব্যে আবির্ভূত হয়েছিল মধুসূদনের বহুমুখী প্রতিভা। বাংলাকাব্যের বহু ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় চিরকালের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে, কিন্তু কাব্যে প্রকৃতিচিত্র অবতারণার ক্ষেত্র তাঁর প্রতিভার সে সফল স্পর্শ পায়নি। যদিও মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবুও তাঁর মানসিক বিচরণের ক্ষেত্র ছিল পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষ, হোমার-ভারজিলের যুগের গ্রীস-রোম এবং মিলটনের যুগের ইংলণ্ড। প্রকৃতি বর্ণনায় তথা কাব্যে প্রকৃতির ব্যবহারে কবি প্রাচীন রীতিরই অনুগামী। প্রাকৃতিক বস্তুকে অবলম্বন করে লেখা কতগুলি কবিতা চতুর্দশপদী-কবিতাবলীতে স্থান পেয়েছে, কিন্তু সংস্কারহীন দৃষ্টির পরিচয় তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। ব্রজাঙ্গনাকাব্যে মধুসূদন যে বৈষ্ণব আদর্শের পদরচনা করেছেন তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সৃষ্ট রাধিকা সখীহীনা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তার সখীস্থান অধিকার করেছে, তাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি প্রেমোচ্ছ্বাস, আক্ষেপ, বিরহানুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করেছেন। মেঘনাদবধে সীতা ও সরমার কথোপনের মধ্যেও আরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সীতার সখীত্বের আভাস আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতিতে অনুভূতির আরোপ আলংকারিক রীতিতেই পরিসমাপ্ত, কালিদাসের শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মতো গভীরতা এ-কাব্যগুলিতে নেই। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁর নায়িকারা কালিদাসের বহু পশ্চাতে পড়ে আছেন। প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনায় প্রাচীন বাংলার কবিদের বিফলতা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মধুসূদন কিঞ্চিৎ সফলতার গৌরব করতে পারেন। গম্ভীর শব্দ সমাবেশ এবং ছন্দের বৈশিষ্ট্যের জন্য মাঝে মাঝে প্রকৃতির ভীষণ রূপটি মধুসূদনের কাব্যে ধরা পড়েছে। তবে প্রকৃতির

রুদ্ররূপ বর্ণনার সুযোগ মধুসূদন অবহেলা করেছেন, এরূপ প্রমাণেরও অভাব নেই। মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার স্থান প্রচুর, এমন কি প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর কাব্য ভারাক্রান্ত একথা বললেও বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সুযোগও তিনি অবহেলা করেননি। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বের জন্য এবং চিরাচরিত সংস্কারের প্রভাবে তাঁর কাব্যের প্রকৃতি স্বাভাবিকতায় সজীব হয়ে উঠতে পারেনি। ইংরেজ কবি ও কাব্যের অনুকরণে তিনি যেখানে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করবার প্রয়াস পেয়েছেন সেখানেও তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি প্রকৃতিকাব্য সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা গীতিকবিতায় হেমচন্দ্র একটি নূতন আভাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। ইংরেজ কবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে হেমচন্দ্র একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতি-দৃশ্যকে আপনার মনের ভাবের সংস্পর্শে সজীব করে তুলতে পারলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য গীতিকবিতার সুরটিও তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়ে উঠবে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত চেষ্টা করেছিলেন চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকাতে, আর হেমচন্দ্রের প্রচেষ্টা ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের দিকে তাকিয়ে আপনার মনের ভাবকে উজ্জীবিত করে তোলা। এ প্রচেষ্টা বাংলাসাহিত্যে নূতন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনুভূতির যথেষ্ট গভীরতা না থাকায় অনেক সময় প্রকৃতির সঙ্গে নিজের ভাব মিশাতে গিয়ে কবি শুধু ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে আপনার অন্তর্লোকে অভিসার তাঁর প্রায়ই বিফল হয়েছে। বাইরে থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর মনের ভাব জুড়ে দিয়েছেন মাত্র, অন্তরে অন্তরে মিলন হয়নি। কবির সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিই হয়তো এর কারণ। ঈশ্বর গুপ্ত পরিণত কবিপ্রতিভার অভাবে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী হয়েও সে-দৃষ্টিকে কাব্যরসে অভিষিক্ত করে তুলতে পারেননি। হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভাতে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই, একটা বিশেষ মনোভাব নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাতে হয় এ-ধারণাও তাঁর ছিল, কিন্তু যে দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন তার মধ্যে সরসতা ছিল কম। সংস্কারময় দৃষ্টির অস্বচ্ছতা প্রকৃতি আর তাঁর অন্তর্লোকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের ব্যর্থতাকে মেনে নিলেও তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়না। হেমচন্দ্রের প্রতিভা নবীনচন্দ্র

ও বিহারীলালের কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণতির পথে রবীন্দ্রনাথে এসে সাফল্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নবীনচন্দ্রও প্রধানত মহাকাব্যজাতীয় রচনায় আপনার প্রতিভার প্রকাশের পথ খুঁজেছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর দৃষ্টিতে সরসতা বেশি ছিল, তাই হেমচন্দ্র অপেক্ষা এক্ষেত্রে তাঁর সফলতাও বেশি। প্রাচীন আলংকারিক রীতিতেও যখন নবীনচন্দ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তখনও এই সরস দৃষ্টি তাঁর কাব্যকে অনেক পরিমাণে সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে। তাঁর প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে কবির নির্বাচনরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রুচির অভিব্যক্তিতে কবির নিরাবরণ চিত্তটি পাঠকের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বলে নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনায় আত্মলীনদৃষ্টির কিছুটা আভাস এসে গেছে। সে আভাসের স্পষ্টতা বিহারীলালের কাব্যে।

৩

বিহারীলালের কাব্যসাধনায় বাংলা কাব্যের যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়নি, কিন্তু একটি আগতপ্রায় নবযুগের আভাস স্পষ্ট সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ 'ভোরের পাখি' বলেছেন[১]; বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় প্রতিভার আলো বিচ্ছুরিত হবার পূর্বে বিহারী-লাল গান ধরেছিলেন। সে গান রবীন্দ্রনাথের আগমনের স্পষ্ট ইঙ্গিতে পূর্ণ। তাই বিহারীলাল 'ভোরের পাখি'। কাব্যে প্রকৃতির ব্যবহারেও তাঁর এই নাম সার্থক। প্রকৃতিবর্ণনায় সরসতা এবং সংস্কারহীন দৃষ্টি বিহারীলালের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। কবি প্রাচীন যুগের কবিদের সৃষ্ট প্রকৃতির রাজ্যে বিহার করেননি এমন নয়, কিন্তু সে প্রকৃতিকে একটা বিস্ময় এবং অর্ধপরিচয়ের রহস্যের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে রোমানটিক সরসতা দান করেছেন। পূর্ববর্তী কবিদের মত প্রাচীন যুগের অন্ধ অনুকরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথও এ-বিষয়ে বিহারী-লালের সমধর্মী। এক্ষেত্রে দুজন কবিরই ইংরেজ কবি কীটসের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। কীটসও প্রাচীন যুগের গ্রীসের মধ্যে রোমানটিক আনন্দের উৎস

১ আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল।

আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর কাব্যের এই বিশেষত্বটিকে ইংরেজ সমালোচকগণ Hellenism আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন কালের সৃষ্টিতে রোমানটিক আনন্দ খুঁজে পাওয়ার কথা ছেড়ে দিলেও প্রকৃতির প্রতি বিহারীলালের দৃষ্টি সাধারণ-ভাবে রোমানটিক ভঙ্গির পরিচয় দেয়। সমাধানহীন রহস্যের মধ্যে জানা অজানার মিশ্রণে যে আনন্দের উৎপত্তি রোমানটিক কবির প্রধান উপজীব্য, বিহারীলালের কাব্যে তার অভাব নেই। রোমানটিক বিষাদের সুরটিও তাঁর রচনায় ভুল করবার উপায় নেই। প্রকৃতির প্রতি এই নূতন দৃষ্টির পরিচয়ে বিহারীলালের নিকট রবীন্দ্রনাথের ঋণ প্রচুর, পরে যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব। রোমানটিক অনুভূতিতেই বিহারীলালের কাব্যজীবনের সাধনা সমাপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁর অস্পষ্ট রোমানটিক অনুভূতিকে তিনি মিস্টিক অনুভূতিতে পরিণত করেছেন। প্রকৃতির যে ইঙ্গিতগুলি তাঁকে রহস্যময় বিস্ময়ের আনন্দ যোগাত সেগুলির পশ্চাতে তিনি এক অসীম সত্তার সন্ধান পেয়েছেন। জানা-অজানার সব রহস্য সেই অসীমের রহস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গভীরতর সার্থকতায় মুক্তি পেয়েছে। এই অসীম সত্তাকে কবি সারদা নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবি ওআর্ডসওআর্থের উপলব্ধ প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলের রহস্যময় সত্তার মতো বিহারীলালের সারদা কেবল কল্যাণ ও শান্তিময়ীই নন; ইনি সৌন্দর্যরূপে আমাদের মুগ্ধ করেন, প্রেমরূপে পবিত্র করেন, মঙ্গলরূপে বিধৃত করেন এবং জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ভাসিত করে তোলেন। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারবলে সৌন্দর্য আনন্দ ও জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যটিকে কবি সংযুক্ত করে দিতে পেরেছেন।

প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় বিহারীলালের আরএকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব। এক্ষেত্রে ইংরেজ কবি কীটসের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু রূপরসগন্ধ নয়, বিশেষ করে স্পর্শজনিত আনন্দের আবেগ নিয়ে প্রকৃতি অনেক সময় তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে স্পষ্ট আকারে এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করা যায়, পরিণত কাব্যজীবনেও বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত নেই তা নয়। তবে অতি সহজেই রবীন্দ্রনাথ এই

আবেগময় আনন্দকে গভীর রসানুভূতির আনন্দে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, এই রসানুভূতি আবেগময়তার পরিধিকে অনায়াসেই অতিক্রম করে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনা

সন্ধ্যাসংগীতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রকৃত সূচনা, তার আগেকার কৈশোর রচনাগুলিকে কবি স্বয়ং কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট প্রকৃত সূচনার আগেও সূচনা আছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো'।[১] সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী যুগে রচিত অধুনাঅপ্রচলিত কাব্যগুলি আলোচনা করলে আমরা কবির শৈশবের কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যে অন্য কবির প্রভাব এবং তাঁর স্বকীয় সুরটির ক্রমবিকাশের পরিচয় পাব। খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি ছেড়ে দিলে কবির প্রথম যুগের কাব্যরচনার নিদর্শন হচ্ছে বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, শৈশবসংগীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও বাল্মীকিপ্রতিভা। এর মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী এবং পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা কবির রচনাসংগ্রহের মধ্যে স্থান পেয়েছে। রুদ্রচণ্ড কাব্যাকারে লিখিত নাটিকা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা বাল্মীকিপ্রতিভার প্রায় সমধর্মী গীতিনাট্য। আর ভগ্নহৃদয়ের আকার যদিও নাটকের মতো কবি এ-গ্রন্থকে গীতিকবিতাই বলেছেন। 'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক না মনে করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।'[২]

বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় এবং শৈশবসংগীত এই কয়টি কাব্য পাঠ করলে প্রকৃতির প্রতি কবির শৈশবদৃষ্টির যে বিশেষত্বগুলি চোখে পড়ে তার

১ যোগাযোগ, পৃষ্ঠা ১।

২ ভগ্নহৃদয়, ভূমিকা।

মধ্যে প্রধান হল প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবধানের ফলে তাঁর শিশুমনের প্রতিক্রিয়া। অত্যন্ত শিশুবয়স থেকে প্রকৃতি তাঁকে যে মায়াময় ইঙ্গিত দিয়ে যেত, বদ্ধ ঘরে বসে নিরুপায় শিশুমনে শুধু তারই অনুরণন চলত। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে অবাধ মিলনের সুযোগ প্রথম ঘটল পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়যাত্রার পূর্বে অল্প কয়েকদিন বোলপুর-প্রবাসে। জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ আছে, 'তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে পৃথ্বীরাজের পরাজয় বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই'।[১] গৃহের বন্ধন থেকে সদ্য-মুক্ত শিশুমনে বীরভূমের খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকা-সংকুল রুক্ষ গেরুয়া প্রান্তর কি প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল, এই কাব্যটিতে হয়তো তার সন্ধান পাওয়া যেত। কাব্যটি বিনাশপ্রাপ্ত হওয়াতে সে সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছে।[২] পরবর্তী কাব্য বনফুল হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যহিত পরেই লেখা। তার সূচনাতেই হিমালয়বর্ণনার প্রয়াস দেখে আমাদের অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজতসুষমাময়, প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রিশিখরদেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত-সীমায় যেন গিয়া অবসান।

—বনফুল, দীপনির্বাণ

সদ্য গৃহকারার বন্ধনমুক্তির আনন্দে উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রথম স্পর্শসুখের বিহ্বলতায় তাঁর এই কাব্যগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সমারোহ এবং প্রকৃতিবর্ণনার আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে প্রকৃতির সাহচর্য আর মানুষের প্রেমের প্রভাব ও দ্বন্দ্বই বনফুল কবিকাহিনী

১ জীবনস্মৃতি, হিমালয়যাত্রা।

২ অনেকে মনে করেন পরবর্তী রুদ্রচণ্ড এই কাব্যের পরিবর্তিত রূপ। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৯০।

ও ভগ্নহৃদয়ের মূলকথা। কিন্তু কবি তখনও আপনার প্রকাশভঙ্গির স্বকীয়তা খুঁজে পাননি। তাই যেমন মানুষের মনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়াটি উপাখ্যান ও নাটকের আকারে অন্যের জবানিতে প্রকাশ করছেন, তেমনি তাঁর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, তাঁর ভাষা, ভঙ্গি, ও প্রাকৃতিক উপাদানের সংস্থানেও অন্যের জবানির ছাপ রয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে কয়েকটি শক্তিশালী প্রতিভার সংস্পর্শে বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনেব স্থচনা হয়েছিল। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই পরিবর্তনের প্রেরণা যে রূপ নিয়েছিল, আমরা সংক্ষেপে তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। বিশেষ দিকের এই পরিবর্তনটি সকল কবির রচনায় সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। কিন্তু এই যুগের খ্যাত এবং অখ্যাত প্রায় সকল কবির কাব্যেই প্রাকৃতিক পরিবেশ অঙ্কনে কয়েকটি রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পর্বতদৃশ্য বর্ণনা, সমুদ্রের চিত্র অঙ্কন, শ্মশান অথবা পাতালের বর্ণনা, আরণ্যপ্রকৃতির সংস্থান ইত্যাদি কাব্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলাল প্রভৃতি সকল কবির কাব্য থেকেই এ-উক্তির অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। অরণ্য পর্বত শ্মশান ইত্যাদির বর্ণনা যে কি করে এ-রকম প্রাধান্য লাভ করেছিল বলা কঠিন, তবে অপেক্ষাকৃত কম খ্যাত কবিদের কাব্যেও এরূপ বর্ণনার অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উল্লেখ করতে পারি। বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য লেখকদের উপর এই কাব্যগ্রন্থের প্রভাবের গুরুত্ব না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের শিশুমনে যে এর গভীর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, 'বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘনঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই'।[১] স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার আবহাওয়ার মধ্যে ছিলেন বলেই তাঁর শৈশবের রচনায় এ-কাব্যের প্রভাব কিছু আছে। তখনকার দিনে হেমচন্দ্র এবংনবীনচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের দুই দিকপালের মতো

১ জীবনস্মৃতি, বাড়ির আবহাওয়া।

বিরাজ করছিলেন। জ্ঞাতেবা অজ্ঞাতে তাঁদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া বিচিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর হেমচন্দ্রের প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে 'হিন্দুমেলার উপহার' নামক একটি কবিতায়। ১২৮১ সালের হিন্দুমেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রের ভারতসংগীতএর অনুকরণে এই কবিতাটি লিখেছিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রভাবের এত স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও মাঝে মাঝে দুই কবির সাদৃশ্য আবিষ্কারকরা কঠিন নয়। প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে এই কবিদের বিশেষত্বগুলি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আকর্ষণ করেছিল এবং এই শৈশব রচনাগুলিতে সে আকর্ষণের স্বীকৃতি রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী জীবনে যাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চিহ্নিত হয়েছে তিনি কবি বিহারীলাল। বিহারীলালের সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, 'এই সময় বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল-সংগীত আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।... কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল।... তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি।...বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ওই পর্যন্ত দৌড়িত'।[১] অন্যত্র আছে, 'এই কাগজেই (অবোধ বন্ধু) বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত'।

২

স্পষ্টই বোঝা গেল বিহারীলালের কাব্যই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল। কিন্তু সে-যুগের অন্যান্য কবির অনুরণনও তাঁর কাব্যে এসেছে। সেটা স্পষ্ট প্রভাব না হলেও সে-যুগের সাহিত্যিক আবহাওয়ায় সেটা রবীন্দ্রনাথের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল এ কথা মেনে নিতে দোষ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে কবিচিত্তের আদানপ্রদানের যে নূতন ভঙ্গিটি ইংরেজিসাহিত্যের সান্নিধ্যে আমাদের

১ জীবনস্মৃতি, সাহিত্যের সঙ্গী।

২ জীবনস্মৃতি, ঘরের পড়া।

কাব্যে প্রবেশ করেছিল, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলালের কাব্যে তার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনার অনেকগুলি যদিও আখ্যানকাব্য তবুও তার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং বর্ণনার নূতন ভঙ্গিটি মাঝে মাঝে স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার সময় আমরা তার বিচার করব।

এখানে এই তিনজন পূর্ববর্তী কবির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। পূর্বেই উল্লেখ করেছি হেমচন্দ্র প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অন্তরের নিভৃত প্রদেশের চিন্তাধারাগুলিকে উজ্জীবিত করে তোলবার প্রয়াস করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের একটি যোগসূত্র আছে।

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিন প্রভেদ এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?

—যমুনাতটে, কবিতাবলী

মানবের চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতির এই সম্বন্ধের চেতনাকে যদিও তিনি সর্বত্র কবিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেননি তবুও এই সম্বন্ধের সত্যতা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে তাই ব্যথিতমনের সান্ত্বনাও তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবনপিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত উপরি
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে।

—যমুনাতটে, কবিতাবলী

রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনা কবিকাহিনীতে অনুরূপ ভাব এবং প্রায় সদৃশ প্রকাশভঙ্গি সংক্রামিত হয়েছে।

কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে,
পুরাণো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি।
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায়নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবানিশি তার,
হৃদয়ের এক দিক্ শূন্য হয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্মভেদী একটি নিশ্বাস ?

—কবিকাহিনী, তৃতীয় সর্গ

ভাব ও ভঙ্গির এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। তবে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করতে তার আর দরকার নেই। প্রকৃতিকাব্যে হেমচন্দ্রের এই বিশেষত্বটি নবীনচন্দ্রের কাব্যেও ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে তিনিও তাঁর মতই ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, তথা সমাজরাষ্ট্র ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচিত্র চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সফলতাও হেমচন্দ্রের চেয়ে বেশি নয়। তাই এ-বিষয়ে নূতন করে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। সেটা হল প্রকৃতি-বর্ণনায় দৃশ্যসংস্থানের সজীবতা। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় এই গুণটির আমরা বিশদ পরিচয় দেব একটু পরেই। বিহারীলাল এবং নবীনচন্দ্রেরও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। কিন্তু বহুবিষয়ে নবীনচন্দ্রের প্রভাবের কোনো গুরুত্বই নেই, কারণ নবীনচন্দ্রের বহুবিখ্যাত রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনাগুলির পরে। অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্যটি আকস্মিক অথবা রবীন্দ্রনাথই নবীনচন্দ্রের আদর্শ। বিহারীলালের প্রভাবকে কবি জ্ঞাতসারে এবং স্বেচ্ছায় তাঁর কবিতায় মেনে নিয়েছিলেন। প্রকৃতিবর্ণনায় সরসতায় এবং প্রকৃতির প্রতি রোমান্‌টিক ও মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বহুপরিমাণে

বিহারীলালের প্রভাব বহন করছেন। সে প্রভাব শুধু শৈশবরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যথাস্থানে আমরা তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মধ্যে একটা রোমানটিক বিষাদের সুর রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনাগুলিতেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই।

কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃত, স্বপনবেশে পরানের কাছে এসে
আধস্মৃতি জাগাইয়া তুলে।

—শৈশবসংগীত, অতীত ও ভবিষ্যৎ

অতি শৈশবে প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন তার স্মৃতি আজকের উপভোগের অতৃপ্তিতে কি যেন বেদনা জাগিয়ে তুলেছে। বিহারী-লালের কাব্যের এসুরটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা যুগিয়েছিল মনে করা অস্বাভাবিক হবে না। বিহারীলালের শরৎকাল কাব্যে আছে,

চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়।

—শরৎকাল, সন্ধ্যাসংগীত

৩

শৈশবরচনাগুলির মধ্যে মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শবঞ্চিত বালক রবীন্দ্রনাথের মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে একথা আগেই বলেছি। তার জন্যই বোধহয় এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রকৃতির এতো প্রাধান্য। বনফুল কাব্যে আজন্ম প্রকৃতির অঙ্কে পালিতা নায়িকা সংসারের মধ্যে কোনো আনন্দের উপাদানই খুঁজে পায়নি। স্বামীর ভালোবাসাও তার হৃদয়কে পূর্ণ করতে পারেনি। শেষে একদিন নিজে ভালোবেসে সে জীবনের আনন্দ আবিষ্কার করল, কিন্তু ঈর্ষান্বিত স্বামী তার ভালোবাসার পাত্রকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলল। নায়িকা তার বাল্যকালের

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ফিরে গেল, কিন্তু মানুষের প্রেমহীন প্রাকৃতিক পরিবেশ তার কাছে অর্থহীন হয়ে রইল। নায়িকার মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। কবিকাহিনীতেও প্রকৃতির মানসসৃষ্টি কবি প্রকৃতির মধ্যে আপনার কল্পনার পরিতৃপ্তি না পেয়ে কিছুদিন মানবপ্রেমের অনুবর্তী হয়েছিলেন। কিন্তু তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা তাতেও তাকে বদ্ধ হয়ে থাকতে দিল না। তিনি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। বহুদিন পরে আগের মতোই অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তার প্রেমিকা মৃত্যুশয্যায়। কবি হিমালয়ের বিরাট্ আশ্রয়ে অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে এবং ব্যক্তিগত প্রেমকে বিশ্বপ্রেমের আদর্শে উন্নীত করবার কল্পনায় জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিয়ে তুষারসমাধির মধ্যে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। দুটি কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেম মানবপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের বিচিত্র দ্বন্দ্বের আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। শিশুসুলভ সারল্য ও আতিশয্য থাকলেও এই কাব্যদুটির মধ্যে তাঁর কাব্যজীবনের বহু নূতন নূতন ভাবের সূচনা দেখা যায়। পরবর্তী কালে ভাবের এই মুকুলগুলি পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

বনফুলের নায়িকার আরণ্যপ্রকৃতির কাছ থেকে বিদায়ের দুঃখে অরণ্যের ব্যাকুলতা শকুন্তলা নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়;
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখ পানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়।…
কুটির ডাকিছে যেন, যেও না— যেও না!
তটিনীতরঙ্গকুল, ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন, যেও না— যেও না!
বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙুল তুলি
যেন বলিছেন আহা, যেও না— যেও না।

হরিণীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে টানবার চিত্রটি সম্ভবত শকুন্তলা থেকেই ধার করা। নায়িকার বিদায়ে এরূপ ব্যাকুলতা সংস্কৃত কাব্যে অজস্র। মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাংলাকাব্যেও এ-রকম বর্ণনার অভাব নেই। কিন্তু রঘুবংশের একটি বর্ণনার সঙ্গে এ-বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। লক্ষণ অগ্রজের আদেশে যখন সীতাকে বনে রেখে ফিরে আসছিলেন তখন

অবার্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ।

—রঘুবংশ ১৪।৫১

জাহ্নবী তার তরঙ্গময় হস্ত উত্তোলন করে যেন লক্ষ্মণকে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত কববার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বনফুলে আরণ্যপ্রকৃতি, জ্যোৎস্নারাত্রি, নদী-নির্ঝর এবং সে-যুগের রীতি অনুযায়ী পর্বত ও শ্মশানের একাধিক দীর্ঘ বর্ণনা আছে। বর্ণনাগুলি অধিকাংশ স্থলেই গতানুগতিক উপাদানের সাহায্যে অঙ্কিত। হরিণশিশুর চপলতা, অলির গুঞ্জন, কুসুমের পরিমল সমস্তই এ বর্ণনায় ভিড় করে এসেছে; তবুও মাঝে মাঝে কবির অন্তর্দৃষ্টি এবং সরস প্রকৃতিবর্ণনার প্রয়াস দু-একটি ছোটো কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি
জ্যোছনা মাখিয়া গায়ে উড়ে উড়ে যায়।

—বনফুল, চতুর্থ সর্গ

উদিল প্রদোষতারা সাঁঝের আঁচলে।

—বনফুল, অষ্টম সর্গ

বর্ণনাগুলি আমাদের উক্তির সমর্থক। সপ্তম সর্গের শ্মশানবর্ণনার সূচনাতে আছে।

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ।
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন।
সরসর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়।

—বনফুল, সপ্তম সর্গ

এটি স্বপ্নপ্রয়াণকাব্যের একটি পাতাল বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গম্ভীর পাতাল! যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়॥

—স্বপ্নপ্রয়াণ, পঞ্চম সর্গ

বনফুলের শেষদৃশ্যে হতাশপ্রেমিকা কমলা শৈশবের সাথী প্রকৃতির মধ্যে তার বিষাদের সান্ত্বনা না পেয়ে মৃত্যুবরণ করল। পর্বতের উপরে কমলার মূর্তিটি যেন ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এল। মস্তকে মেঘ ধরে, তুষারের মধ্যে বসনাঞ্চল মিশিয়ে দিয়ে পর্বতের শিখরের মতো কমলার পাষাণ মূর্তিটি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। শেষে পর্বতচূড়ার মতোই কমলা নীচের উচ্ছল তটিনীর বুকে ভেঙে পড়ল, তার দেহলাবণ্য যেন জলধারার সফেন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল।

প্রশান্ত তটিনী চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
ধরিল বুকের পরে কমলা বালায়!
উচ্ছ্বাসে সফেন জল উঠিল নাচিয়া।
কমলার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায়!
কমলার দেহ বহে সলিল উচ্ছ্বাস!
কমলার জীবনের হল অবসান।

—বনফুল, অষ্টম সর্গ

যে প্রকৃতির মধ্যে কমলা আবাল্যলালিত তারই দেহে কমলার এই আত্ম-বিলুপ্তি প্রকৃতির প্রতি কবির একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

৪

এই দৃষ্টিভঙ্গির আরএকটি দিক্ পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ কবিকাহিনীর সূচনাতেই আছে। কবিকাহিনীর নায়ক কবি শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির মধ্য থেকে তার দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রেরণাও আহরণ করেছে।

জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

শৈশবে শুধু অজানা আকর্ষণ; যৌবনে প্রকৃতির সাহচর্যের মধ্যে সে আকর্ষণ গভীরতর অর্থ পেল।

যৌবনে যখন কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

দীর্ঘ নিবিড় সাহচর্যের ফলে প্রকৃতির শোভা তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে তার মনের সুষমা গড়ে তুলল, প্রাকৃতিক সম্পদের উপাদানগুলি তার মনের সম্পদ হয়ে উঠল।

হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনাপরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবী, দেবি, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধুহৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মতো মুক্ত সমীরণ
হুহু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

এই অংশটি আমাদের পাশ্চাত্ত্য কবি ওআর্ডসওআর্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির মানসদুহিতা লুসিও জলকল্লোল, মেঘের সঞ্চরণ, নিথুতি তারার সুষমা এবং ঝড়ের রুদ্রমূর্তি থেকে দৈহিক সৌন্দর্য আহরণ করেছিল।

The floating clouds their state shall lend
To her ; for her the willow bend ;
Nor shall she fail to see
Even in the motions of storm
Grace that shall mould the maiden's form
By silent sympathy.
The stars of midnight shall be dear
To her ; and she shall lean her ear
In many a secret place
Where rivulets dance their wayward round,
And beauty born of murmuring sound
Shall pass into her face.

—Lucy

পরবর্তী কালে অহল্যার প্রতি প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি-ভঙ্গির চরম পরিণতি ঘটেছে। সেখানে প্রকৃতির থেকে আহৃত সৌন্দর্যের যে মহিমময় মূর্তি কল্পিত হয়েছে তার তুলনা নেই।

কবিকাহিনীতেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম প্রকৃতির রুদ্ররূপ না হলেও বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট্ রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। বনফুলে যদিও হিমালয় বর্ণনা আছে এবং সে বর্ণনায় প্রকৃতির বিশালতার আভাস দেবার চেষ্টাও ক্ষীণ নয়, তবুও সচেতনভাবে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রকৃতির বিরাট্ রূপ এবং অমোঘ নিয়মের পরিচয় কবিকাহিনীতেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব চরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি, হে আদিজননি,

শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।...
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সেকি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এজগতে,
কক্ষছিন্ন কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে হেথায় হোথায়;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনায় বাঙালি কবিদের বিফলতা প্রায় সর্বত্র। এই দিক্ থেকে বিচার করলে এক্ষেত্রে একজন বালক কবির এই সাফল্য ক্ষুদ্র হলেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মতো
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্বতশিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে,
তুষার সঙ্ঘাত রাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

এধরণের বর্ণনাতে পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে একমাত্র মধুসূদনের সাফল্যই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতি কবি যে অতি শিশু-কালেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ কবিকাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃতির শান্তরূপ, তার কোমলতাও কবি চিত্তকে অনুরূপ ভাবেই নাড়া দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুএর সংমিশ্রণেই শিশুকবির প্রকৃতি অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

হে প্রকৃতি দেবি, তুমি মানুষের মন
কেমন বিচিত্র ভাবে রেখেছ পূরিয়া,
করুণা, প্রণয়, স্নেহ, সুন্দর শোভন,
ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য আদি সমুচ্চ মহান্,
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি ভয়ানক ভাব
নিরাশা মরুর মত দারুণ বিষণ্ণ—
তেমনি আবার এই বাহির জগৎ
বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

প্রকৃতির মধ্যে এই বিচিত্র ভাবের সমন্বয়ই পরবর্তী কালে কবিকে মিস্টিক করে তুলেছে। অনন্তের প্রতি আকর্ষণ, বিরাটের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে দিয়ে যে আত্মোপলব্ধি মিস্টিক দৃষ্টির সহায়ক তাও কবিকাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির এই বিরাট্ এবং বিচিত্র রূপ কবিচিত্তকে বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছে।

তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার
তাই ভাবিয়াছি আমি, হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা।

—কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ

রোমানটিক বিষাদের সঙ্গে অনন্ত প্রকৃতিকে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা কবির শিশুচিত্তেই অঙ্কুর মেলেছিল। এটা কম বিস্ময়ের বিষয় নয়।

কবিকাহিনীতেও একটি দীর্ঘ হিমালয়বর্ণনা আছে, সে হিমালয়ের রূপ শান্ত। বিরাট্ এবং শান্ত হিমালয়ের সঙ্গে মানব জীবনের তুলনা করে কবি এই মনুষ্যজগতের রক্তপাত অত্যাচার পাপ কোলাহল ইত্যাদি দেখে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু কবি আশাবাদী, তিনি জানেন মানুষের চঞ্চলতা একদিন শেষ হবে, বিশ্বমানবের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে।

প্রকৃতির সব কার্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।

—কবিকাহিনী,চতুর্থ সর্গ

এটা ঠিক প্রকৃতি থেকে শুষ্ক নীতি সংগ্রহের উদাহরণ নয়। কবির পরবর্তী জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তরালে এক অনাবিল চিরশান্তির উপলব্ধি তাঁর শৈশবচিন্তারই উত্তরাধিকার, এখানে তার প্রমাণ আছে।

ভগ্নহৃদয়ের পাত্রপাত্রীদের উক্তিপ্রত্যুক্তি নাটকের মতো করে সাজানো, কিন্তু সমগ্র রসটি নাটকীয় নয়। কবিও একে কাব্য আখ্যা দিয়েছেন। এই কাব্যেও একটি কবিচরিত্র আছে, তার মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ কবিসাধারণের, বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণা ও কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবির মনের মধ্যে যে সুন্দর বিশ্বপ্রকৃতির ছায়া পড়েছে পৃথিবীর চোখে দেখা পরিমিত প্রকৃতি সে সৌন্দর্যের বহু পশ্চাতে পড়ে থাকে, চোখের দেখায় তাই দেখার ক্ষুধা মেটে না। বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিশে অনন্ত আনন্দ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা কবিকে পেয়ে বসেছে।

অনন্ত আকাশ যদি হত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
অগণ্য তারকারাশি হত তার খেলেনা কেবল,

চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিতনা অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি
আনন্দসংগীত স্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি।

—ভগ্নহৃদয়, প্রথম সর্গ

গভীর বিষাদ আর অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় মিশে কবির রোমানটিক মনের রঙটি এই কাব্যের মধ্যেও আপনার বৈচিত্র্য ছড়িয়ে রেখেছে।

ভগ্নহৃদয় কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল এর রূপকাত্মক নিসর্গ-চিত্রগুলি। প্রকৃতি থেকে উপমা রূপক ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা সর্বপ্রথম এই কাব্যটিতেই একটা সাফল্যময় পরিণতির সূচনা করেছে। প্রাকৃতিক উপাদান এবং উপমানগুলি অনেক সময় প্রাচীন, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গির নূতনত্ব, তুলনীয় বস্তুগুলির সাদৃশ্যের অভিনবত্ব, আর একটি অর্ধপরিচয়ের রোমানটিক রহস্য উপমাগুলিকে স্বকীয়তা দান করেছে। ভগ্নহৃদয়ে কবি তাঁর প্রেমের নব উন্মেষের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু সেই আনন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সে আনন্দকে তিনি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার
মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার।
সূক্ষ্ম আবরণ, গাঁথা সন্ধ্যামেঘস্তরে,
পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের পরে!
কিছু যেন দেখেও দেখেনা আঁখিদ্বয়,
সকলি অস্ফুট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময়!

—ভগ্নহৃদয়, ষষ্ঠ সর্গ

ভগ্নহৃদয় রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর। তখন মনের মধ্যে অস্পষ্ট অথচ সুন্দর যে ভাবগুলি বিচরণ করে বেড়ায়, এই কাব্যের রূপকাত্মক প্রকৃতি-চিত্রগুলি যেন তারই ছায়া। সন্ধ্যালোকের আবছা রহস্যময়তা, সমুদ্র ও আকাশের মিলনের দিগন্তবিস্তৃত পিপাসা, নিযুতি সন্ধ্যাতারকার সুষমা, এগুলিই তাঁর মনকে টেনেছে বেশি করে। প্রকৃতিদৃশ্যের মধ্যে যেখানে স্পষ্টতা সেখানে

তাঁর কবিমনের নিমন্ত্রণ ছিল না। নীচের উপমাগুলির মধ্যে একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সমুদ্র চাহিয়া থাকে আকাশের পানে,
আকাশ সমুদ্রে চায় অবাক্ নয়নে,
তেমনি দোঁহার হৃদি হেরিবে দোঁহায়,
পড়িবে উভের ছায়া উভয়ের গায়!

—ভগ্নহৃদয়, একাদশ সর্গ

অন্ধকার ভেদী এক হাসিময় তারা সম—
প্রাণের ভিতর পানে চাহিয়া রয়েছে মম!
ফিরায়ে লইনু মুখ তবুও কেন গো দেখি
চাহিছে হৃদয় পানে দুটি হাসিমাখা আঁখি!

—ভগ্নহৃদয়, দ্বাদশ সর্গ

প্রকৃতিতে মানবদেহ ও অনুভূতির সাদৃশ্য আরোপ রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের বিপরীত রীতি। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এক রোমানটিক সরসতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি সন্ধ্যাদৃশ্যের বর্ণনা।

সন্ধ্যার কপোল হতে সুধীরে কেমন
মিলায়ে আসিতেছিল সরমের রাগ;
একটি উঠেছে তারা, বিপাশা হরষে হারা
ছায়া বুকে লয়ে কত করিছে সোহাগ!

—ভগ্নহৃদয়, চতুর্দশ সর্গ

রবীন্দ্রনাথ শিশুবয়স থেকেই প্রকৃতির গতানুগতিক উপাদানের সাহায্যে নারীসৌন্দর্য বর্ণনার বিরোধী ছিলেন। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক কবিদের রচনায়, রম্ভাউরু, তিলফুলনাসা, পদ্মলোচন ইত্যাদির অভাব নেই। কিন্তু শিশুকালেই রবীন্দ্রনাথ এই গতানুগতিক প্রভাবের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন; তাঁর মনের এই স্বাধীনতা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৬

শৈশবসংগীতে রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। অধিকাংশই খণ্ড কবিতা, কতকগুলি নাতিদীর্ঘ গাথা। বনফুল ও কবিকাহিনীতে যে রোমানটিক বিষাদের সঙ্গে প্রকৃতি উপভোগের বর্ণনা শৈশবসংগীতেও তার অভাব নেই। আমরা পূর্বে একটি স্তবক উদ্ধার করেছি। পরবর্তী কাব্য সন্ধ্যাসংগীতে এই বিষাদের সুরটি ধ্বনিত হয়েছে স্পষ্টতর গ্রামে এবং নূতনতর প্রকাশ ভঙ্গিতে। শৈশবসংগীতে ফুলবালা নামে একটি গাথায় বিভিন্ন ফুল ভ্রমর ও পাখিকে পরস্পরের সম্পর্কে অনুভূতিশীল বলে কল্পনা করা হয়েছে। কল্পনা কবিকে ফুলের রাজ্যে নিয়ে গেলেন, সেখানে ফুলে ফুলে প্রণয়, ভ্রমরের দৌত্য, মিলনরজনীতে জোনাকির আলো ইত্যাদি মিলে একটি আনন্দময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এ-গাথাটিতে নেই, তবে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পুষ্পগুলির নাম-সংগ্রহে এই গাথাটি সাহায্য করতে পারে। হরহৃদে কালিকা নামক কবিতায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ অঙ্কনের প্রয়াস আছে। মহাপ্রলয়ের দিনে সৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থিত মহাকালীর নৃত্য জাগবে বিশ্ব জুড়ে।

আঁধার কুন্তল তোর মহাশূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কালঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া!
অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহতারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবে সেই বিশ্বচূর্ণ নিশ্বাসেতে উড়ায়ে!

—শৈশবসংগীত, হরহৃদে কালিকা

কালিকার এই রুদ্র বিশ্বরূপ অঙ্কনে মৌলিকত্ব অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুরূপ পটভূমিতে নটরাজকেই স্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিময় এই কালিকামূর্তির পরিকল্পনা কবিচিত্তের মিস্টিক দৃষ্টির পরিচায়ক।

৭

কালমৃগয়া, মায়ার খেলা ও বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য। গীতরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম সফলতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা এই গীতিনাট্যগুলিকে স্মরণীয় করেছে। কিন্তু তাদের সে দিক্‌টি আমাদের অলোচনার বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাই আমাদের বিচার্য। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে-কোনো একটি বিশেষত্বকে বুঝতে হলে তাঁর গানগুলির আলোচনা অবশ্য প্রয়োজন। তাঁর অপূর্ব কবিজীবনের প্রভাত-সন্ধ্যা শরৎ-বর্ষা-বসন্তকে তাঁর গানগুলি যেমন করে ধরে রেখেছে তেমন আর কিছু পারেনি। আমরা তাঁর কাব্যের তীর্থযাত্রার পথে তাদের পরিচয় পেতে চেষ্টা করব। মায়ার খেলার দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় একটি গানে শ্রান্ত সন্ধ্যার সুন্দর বর্ণনা আছে।

সমুখেতে বহিছে তটিনী
দুটি তারা আকাশেতে ফুটিয়া,
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়েছে টুটিয়া।
দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।
এস সবে এস সখি
জলদের খেলা দেখি!
আঁখি পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

—কালমৃগয়া, দ্বিতীয় দৃশ্য

বর্ণনার উপাদানগুলি স্বভাবতই প্রাচীন। প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের প্রাচীন রীতিটিও অনুসৃত হয়েছে, তবুও বর্ণনাগুণে ক্লান্ত সন্ধ্যার নিরালা

ক্ষণটি কি সুন্দর ধরা পড়েছে। কালমৃগয়াতেই একটি বর্ষারজনীর চিত্র প্রাচীন বর্ণনাসম্ভারে চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু কবি বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ষার উপাদানগুলিকে গতানুগতিকতার স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছেন।

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন
সব চরাচর আকুল
কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী,
দিক্‌ললনা ভয়বিভলা।

—কালমৃগয়া, চতুর্থ দৃশ্য

বর্ষণের পূর্বে স্তম্ভিত প্রকৃতি বর্ণনার পর ঘনবর্ষণে সজল প্রকৃতিচিত্র,

ঝম্‌ঝম্‌ ঘনঘন রে বরষে
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরুলতা
ময়ূরময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী-চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।

—কালমৃগয়া, চতুর্থ দৃশ্য

বর্ষার চিরাচরিত উপাদানগুলিকেই কবি আপনার অনুভূতিতে সজীব বর্ষণমুখর একটি সন্ধ্যার সুরে ঝংকৃত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ গুণটির সঙ্গে আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হব তাঁর কাব্যজীবনের পথে পথে। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবিদের কাছ থেকে প্রকৃতিচিত্র ধার করেছেন বহু কবি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি কবির আপনার মনের মাধুরীস্পর্শে সজীব নয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে কালিদাস প্রভৃতির কাব্য থেকে বিশেষ একটি চিত্র গ্রহণ করেছেন সেখানেও তাঁর রোমানটিক মনের সরসতাটি হারিয়ে ফেলেননি। অনন্তকাল ধরে আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত বহিঃপ্রকৃতি থেকেও তিনি যেমন আপনার অনুভূতির উপযোগী চিত্রগুলি স্বাভাবিক কবিপ্রতিভার সাহায্যে নির্বাচন করতে পেরেছেন তেমনি কালিদাসের সৃষ্ট প্রকৃতিচিত্র থেকেও। প্রাচীন

কবিদের কাব্যগুলি তাঁর স্পর্শপ্রবণ মনের কাছে নূতন একটি প্রাকৃতিক পটভূমি তুলে ধরেছে।

কালমৃগয়ার একটি স্থানে ভাষায় ও ছন্দে বিদ্যাপতিকে অনুসরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন-ছায়া ছাইয়া।
কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ উঠে কাঁপিয়া!
—কালমৃগয়া, পঞ্চম দৃশ্য

বিদ্যাপতির পদে আছে,

তিমির দিকভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
—বিদ্যাপতি, মাথুর

বৈষ্ণবকাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমিকে বিশেষ করে বর্ষাকাব্যের পটভূমিকে কবি বহু জায়গায় গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় আছে। এমন কি তাঁর প্রথম দুইটি কাব্য বনফুল ও কবিকাহিনীতে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনদৃশ্যে বৈষ্ণবকাব্যে প্রতিষ্ঠিত যমুনানদীর সংস্মৃতিটি ভুলতে পারেননি। অবশ্য সে-দুটি কাব্যে বৈষ্ণবকাব্যের পটভূমির খুব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। এখানে সে প্রভাব স্পষ্টতর।

বাল্মীকিপ্রতিভা কাব্যে প্রাকৃতিক পটভূমির দীর্ঘ বর্ণনা নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করে কবিসাধারণের প্রতীক বাল্মীকির মনের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্ণনাগুলির স্বতন্ত্র গৌরব অল্প। কিন্তু প্রকৃতির অন্তস্তলে কবি সমস্ত কাব্যানুভূতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে দেখতে পেয়েছেন, এ হিসেবে এই কাব্যটিতে পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে প্রকাশিত একটি বিশেষ দৃষ্টির সূচনা আছে।

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে ;
এ কবিতার মাঝে তুমি কেগো দেবি,
আলোকে আলো আঁধারি।
—বাল্মীকিপ্রতিভা, তৃতীয় দৃশ্য

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থলে বিরাজমান এই অনন্ত সত্তার পদপ্রান্তেই কবি-জীবনের সর্বপ্রকার প্রেরণার মূল উৎস। এর সঙ্গে বিহারীলালের সারদার রূপবর্ণনাটি তুলনা করলে আমরা তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণের পরিমাপ করতে পারব।

কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করি প্রাণ
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে।
জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে
কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মধুরিমা!
—সারদামঙ্গল, তৃতীয় সর্গ

যে মিস্টিক অনুভূতি কবি বিহারীলালের কাব্যের সুরে একটি নূতনত্বের সূচনা করেছিল, রবীন্দ্রনাথও তার থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর প্রথমবয়সের রচনাগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকি-প্রতিভাতে বিহারীলালের প্রভাবের অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে সেগুলি অপরিহার্য নয়।

শৈশবে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জন্মেছিল অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের সংকলিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ পাঠ করে। কবি লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়-কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেই জন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাব ছিল'।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর অনুকূল সাহচর্যে পদাবলীসাহিত্যের প্রতি তাঁর এই শৈশবঅনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরই কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটারটনের বিবরণ শুনে তাঁর মতো করে প্রাচীন কবিদের অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা তরুণ রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল। 'আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটারটন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।··· একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুর হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম, গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'।[২]

অনুকরণের প্রয়াস শুধু ছন্দ ভাব ও ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাকৃতিক পটভূমি রচনাতেও তিনি বৈষ্ণব কবিদেরই অনুসরণ করেছেন। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন, 'পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না'।[৩] অন্যান্য

১ জীবনস্মৃতি, ভানুসিংহের কবিতা।

২ জীবনস্মৃতি, ভানুসিংহের কবিতা।

৩ ভানুসিংহের পদাবলী, সূচনা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড।

বিষয়ে এই উক্তিটি সমগ্রভাবে মেনে নিতে যদিও বা আপত্তি থাকে, বৈষ্ণব-পদাবলীর বিশেষ সীমানাতে রবীন্দ্রনাথের বিচরণের মধ্যে যদিও বা স্বকীয়তার সন্ধান পাওয়া যায়, তবু কাব্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে কবির স্বাধীনতা বৈষ্ণবরীতির দ্বারা কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে একথা মেনে নিতে বাধা নেই। বৈষ্ণব কবিদের মতোই বসন্ত- ও বর্ষা-বর্ণনাই এ-কাব্যের পটভূমির যুগল উপাদান, আনুষঙ্গিক জ্যোৎস্না- ও কৃষ্ণা-রজনীর বর্ণনাও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনাগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ প্রচেষ্টা

বসন্ত আওল রে।
মধুকর গুনগুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
—ভানুসিংহের পদাবলী, ১

এই বর্ণনার সঙ্গে বিদ্যাপতির 'আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত' বা জ্ঞানদাসের 'আওলরে ঋতুরাজ বসন্ত' ইত্যাদির প্রচুর সাদৃশ্য আছে। বর্ণনার উপাদানে এবং শব্দচয়নে এই সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

অন্যত্র অভিসার-বর্ণনায় ভানুসিংহের পদাবলীতে আছে,

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
—ভানুসিংহের পদাবলী, ১৯

এই বর্ষাচিত্রে বৈষ্ণ বকবির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ।
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
—রায় শেখর, অভিসার

কিন্তু মাঝেমাঝে কবি এই অনুকরণের মধ্যেও এমন একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন যা তাঁকে অন্যান্য বৈষ্ণবকবিদের থেকে একটুকু স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বৈষ্ণবকবিদের ভিড়ে ভানুসিংহ হারিয়ে যাননি। গতানুগতিক উপাদানের সাহায্য নিয়েও স্বতন্ত্র একটি ভঙ্গি তিনি রক্ষা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি বর্ষাবর্ণনা উদ্ধৃত করছি। এই পদের লালিত্য কবির স্বকীয়।

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশিথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মদপবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম
বরখত নীরদপুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তালতমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

—ভানুসিংহের পদাবলী, ১৩

একটি বসন্তবর্ণনাও ভানুসিংহেব স্বকীয়তার পরিচয় দিচ্ছে।

মরমে বহই বসন্ত-সমীরণ
মরমে ফুটই ফুল,
মরম-কুঞ্জ 'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।

—ভানুসিংহের পদাবলী, ১

বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে কানুব বাঁশির সুর রাধার মর্মে প্রবেশ করেছে, রাধার কপালের চন্দন ফোঁটার ছটা কৃষ্ণের মর্মে গিয়ে লেগেছে, কিন্তু প্রকৃতি সেখানে বিশেষভাবেই পটভূমি। বসন্তপ্রকৃতির সমাগমে রাধার মর্ম ব্যাকুল হয়ে

উঠেছে, মিলনআকাঙ্ক্ষা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তার সারা মনে, কিন্তু তার মর্মে ফুল ফোটেনি, বসন্তসমীরণ বয়নি বা কোকিল অবিশ্রান্ত ডেকে ওঠেনি। এই বাচনভঙ্গিতে অনুভূতির যে গভীরতা প্রতিফলিত তা ভানুসিংহকে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও বিশিষ্টতা দিয়েছে।

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি, কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখিনি, এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ছেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেই কপিবুকের কবিতা'।[১]

কাব্যরচনার অন্যান্য উপকরণে যেমন, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিতেও তেমনি এই উক্তির সার্থকতা বহুদূর প্রসারিত। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বে প্রকৃতি থেকে কবি প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সে প্রেরণায় পূর্ববর্তী কবিদের সংস্কার মিশে ছিল, সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রকৃতির দিকে তাকাতে পারেননি। তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেও চিরাচরিত রীতিরই প্রশ্রয়। কিন্তু দৃষ্টির সংস্কার এবং প্রকাশভঙ্গির পরকীয়তা সত্ত্বেও 'নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ' মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যাসংগীতেই সর্বপ্রথম ভাষারীতি, ছন্দের ভঙ্গি ইত্যাদিতে যেমন একটা স্বকীয়তা এসেছে, প্রকৃতিপ্রেমেও তেমনি উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য ও প্রকাশভঙ্গিতে মৌলিক ছাঁদ দেখা দিয়েছে। জীবন-স্মৃতিতে কবি বলেছেন, 'জানিনা কেমন করিয়া কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালো-বাসিত ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধকরি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই'।[১] সন্ধ্যাসংগীতের রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকাতেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি আছে, 'কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা ছিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে'।[২]

অন্তরের এই আবরণমুক্তির কতগুলি বাহ্যিক কারণও ছিল। সেকালে প্রচলিত কাব্যের সংস্কার রবীন্দ্রনাথকে শিশুবয়স থেকেই পীড়া দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম হল গতি, উপভোগের একঘেয়েমি এবং প্রকাশের রীতিতে প্রাচীনের মুখাপেক্ষিতার জড়ত্ব তাঁর কাব্যজীবনের পরিপন্থী। সংস্কারের চাপে এবং খ্যাতির মোহে তাঁকে সেগুলো মেনে নিতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু খ্যাতির মুখরতা থেকে আপনার মনে নিবিষ্ট হওয়ার সুযোগ পাবামাত্র তিনি আপনার স্বধর্মটিকে আবিষ্কার করলেন। সে আবিষ্কারের আবেগই সন্ধ্যাসংগীতে রূপ পেয়েছে।

আরএকটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা পূর্বেই বলেছি, ঘরের বদ্ধ আবহাওয়ার থেকে মুক্তি পেয়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কবির শিশুহৃদয় যে উচ্ছ্বাস অনুভব করেছিল, তাঁর শৈশবরচনাগুলি তারই বহিঃপ্রকাশ। শৈশবরচনার প্রায় সবগুলির মধ্যেই হিমালয় বা অন্য কোনো পর্বতের বর্ণনা আছে। সেটা কিছুটা সে-যুগের সংস্কারের প্রভাব, আর কিছুটা বিরাট্ হিমালয় দেখে শিশুমনের প্রথম বিস্ময়ের ফল। কিন্তু পর্বত কোনোদিনই কবিচিত্তকে তেমন করে আকর্ষণ করেনি। তাঁর অধিকাংশ কাব্যের পটভূমি নদী আর উদার আকাশ। কবি নিজেই বলেছেন,

পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি, সেখানে গেলে মনে হয়,

১ জীবনস্মৃতি, সন্ধ্যাসংগীত।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ— সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই, সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে যায়, তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেইজন্যে বাংলাদেশের দিল-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি, এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার।

—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্রধারা, পৃ ৯৫

পর্বতের মতো সমুদ্রও কবিকল্পনাকে তেমন করে উদ্‌বুদ্ধ করেনি কোনোদিন। সমুদ্রযাত্রা কবির জীবনে বহুবার করতে হয়েছে। পূরবী কাব্যের অনেকখানি অংশ সমুদ্রের উপরেই লেখা। তবুও তাঁর কাব্যে সমুদ্রের চিত্র কতো কম। প্রথমবার বিলেতের পথ থেকে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করছি,

কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্‌ বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে ততটা হয় না। তার কারণ আছে, আমি যখন বোম্বের উপর কূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম তখন দেখতেম দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি— ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি, অমনি আমার সমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পরে যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত, তখন মনে হত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি গম্ভীর দিগন্তের মধ্যে বসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না।

—য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, প্রথম পত্র

কিন্তু বাংলা দেশের নদীবিধৌত শ্যামলতায় আর সোনালি রোদে ভরা নীলিমায় কবিমনের আমন্ত্রণ চিরদিনের। চিত্রা, চৈতালি, সোনার তরী আর ছিন্নপত্রে তার পরিচয় অজস্রভাবে ছড়ানো রয়েছে। বাংলাদেশের শান্ত নদীর অবিরাম গতির মধ্যে কবি আপনার মনের অনুচ্ছলিত গতিধর্মকে খুঁজে পেয়েছেন, আর দিগন্তবিস্তৃত উদার আকাশে পেয়েছেন মনের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের প্রশান্তিকে। এই দুটিই তাঁর কাব্যজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। নদী আর আকাশের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা প্রায় সহজাত। সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালেই কবি নদীতীর আর আকাশের শান্ত অবকাশের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতি-দাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন— আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয় বিপদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ— তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।··· বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লেখার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেইখানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না।

—জীবনস্মৃতি, গঙ্গাতীর

সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালেই তিনি তাঁর কবিধর্মের প্রতীক দুইটি প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে আপনার মনকে নিবিষ্ট করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে গঙ্গার পরিবর্তে পদ্মানদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তাঁর কাব্যজীবনের মূল অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিক্ থেকে বিচার করলে সন্ধ্যাসংগীতে তাঁর কাব্যজীবনের প্রকৃত সূচনার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

২

শৈশবরচনাগুলিতে প্রকৃতিবর্ণনার যে সমারোহ ছিল তাতে বর্ণনার প্রৌঢ়ত্ব আছে, কিন্তু সে প্রৌঢ়ত্ব অপরের অনুকৃত। সন্ধ্যাসংগীতে বর্ণনাভঙ্গি শিশুসুলভ সারল্যে পূর্ণ, তবু এ সারল্য নিজের।

এমন জোছনা সুমধুর
বাঁশরি বাজিছে দূর দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুমঘোর।
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা;
মলয় সুদূর বনভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়াগুলি
লাজুক ফুলের মুখ হতে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি।
—সুখের বিলাপ

এ বর্ণনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়। শৈশবরচনাগুলির অনেক বর্ণনার সঙ্গে তুলনায় এ বর্ণনা অপরিণত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অপরের অনুকৃতির প্রয়াসজাত কৃত্রিম পরিণতি সন্ধ্যাসংগীতে সম্পূর্ণরূপেই বর্জিত হয়েছে।

প্রকৃতির চিত্ররূপ কোনো কবিকে বেশি করে আকর্ষণ করে, কারো কাছে বা প্রকৃতির সংগীতরূপেরই প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির চিত্ররূপের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। সন্ধ্যাসংগীতেও দেখতে পাই প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে একটি অস্ফুট কিন্তু নিশ্চিত সংগীতই কবিকে মুগ্ধ করেছে। সন্ধ্যাসংগীত নামটির মধ্যেও একথার স্বীকৃতি আছে।

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী
কেশ এলাইয়া
মৃদু মৃদু ও কী কথা কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে
নিখিলের মুখ পানে চেয়ে।
—সন্ধ্যা

সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটায়, আলো-আঁধারের মিশ্রণবৈচিত্র্যে যে মোহ আছে তা কবিকে তেমন করে টানেনি, শুধু অন্ধকারের মধ্যে কালো কেশের রূপ দর্শনেই তা পরিসমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু শ্রান্ত সন্ধ্যার অনন্ত আকাশে যে ক্লান্তির রাগিণী বেজে ওঠে তা কবির হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে।

হৃদয়ের অতি দূর দূর-দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।
—সন্ধ্যা

অন্যত্র জ্যোৎস্নারাত্রির কোমল আবেশের মধ্যে কবি শুধু বেদনার বাঁশরি শুনেছেন।

এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরি বাজিছে দূর দূর।
—সুখের বিলাপ

ধ্বনিহীন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও কবি ধ্বনিসংগীত আবিষ্কার করতে ব্যগ্র, কবির এ বিশেষত্বটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য।

সন্ধ্যাসংগীতে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সবচেয়ে বড়ো কথা হল অসম্পূর্ণ উপলব্ধির অতৃপ্তি। কবি চান বিশ্বের অনন্ত শোভাসম্পদের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিয়ে তার রসটুকু আকণ্ঠ পান করতে, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিসমাপ্তি তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাই বসন্তবিদায়ে শুধু প্রকৃতির অশ্রুকেই কবি দেখেছেন, শিশিরের ক্ষণিকস্থিতির পর তার ক্ষুদ্র জীবনের অবসান কবির হৃদয়ে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গান গায় এক স্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।

—হৃদয়ের গীতিধ্বনি

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে চলে যাওয়ার রাগিনীটাই কবির কাছে বড়ো করে বেজেছে। কিন্তু এই বিষাদ, প্রকৃতিকে উপভোগের মধ্যে এই অতৃপ্তিকে কবি কাটিয়ে উঠতে উৎসুক, শুধু বিষাদের গানে ভরা প্রকৃতির সাহচর্য থেকে কবি মুক্তি পেতে চান।

হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলি নে তুই,
শুধু ওই গান।
প্রকৃতির শতশত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান।

—হৃদয়ের গীতিধ্বনি

প্রকৃতি অন্তস্তলে যে একটি আনন্দের মহল আছে, সেটার খবর যে আভাসে ইঙ্গিতে কবি পাননি তা নয়। বিষাদের যবনিকা শুধু সে মহলটি তাঁর দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছে।

সেই হাসিরাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই ?
—শিশির

নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও বিষাদের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত কবিকে নিজের নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী করে তুলেছে। অতৃপ্ত উপলব্ধির বেদনা থেকে কবি কঠিন প্রয়াসে মুক্তি পেতে চেয়েছেন।

একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবি শশিতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
—সংগ্রাম-সংগীত

প্রভাতসংগীত

সন্ধ্যাসংগীতের উপসংহারেই প্রভাতসংগীতের সূচনা, যে বিষাদের ফলে চোখের সামনে থেকে জগতের রূপ রস গন্ধ শুকিয়ে আসছিল, প্রকৃতিব হাসিরাশি কবির কাছে অর্থহীন হয়ে উঠছিল, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য কবি আপনার মনের অন্তঃপুরে আহ্বান-সংগীত পাঠিয়েছেন।

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল
মাটিতে পড়িল খসে,
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে।…

আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেন রে শুকায়ে যায়।
বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা
তবে সে খুলিবে প্রাণ।

—আহ্বান-সংগীত

এই যে আপনার বিষাদতর্জিত মনের অন্ধ কারাগৃহ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস তার পশ্চাতে কবিহৃদয়ের একটি নবলব্ধ বিশ্বাস রয়েছে। প্রভাত-সংগীতের ভূমিকায় কবি বলেছেন,

প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা আধটা মননের রূপ।...কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দরমহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলোর নাম, অনন্তজীবন, অনন্তমরণ, প্রতিধ্বনি। অনন্তজীবন বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকার অন্তর্গত, ঢেউএর মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড

মৃত্যু আর জীবনকে যখন আলাদা করে ভেবেছিলেন তখন জীবনের সসীমতা কবিকে পীড়িত করেছিল, প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষণস্থায়িত্বও কবির উপভোগের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিমুখ করে দিয়েছিল। কিন্তু জীবন আর মৃত্যুকে যখন অনন্ত জীবনের পটপরিবর্তনের যুগল ভূমিকারূপে দেখতে পেলেন তখন জীবনের সীমাহীনতা কবির চোখে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। নবলব্ধ এই অনুভূতিকেই কবি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নামে অভিহিত করেছেন। বিশ্বমানবের প্রেম ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরঙ্গতা উপলব্ধির পক্ষে অন্তরায় এই বিশেষ মনোভাবটি

থেকে মুক্তি পাবামাত্র কবির আহ্বান এসেছে জগতের সৌন্দর্যের বিচিত্র মহল-গুলিতে। সখাসখীর সস্মিত দৃষ্টিবিনিময়ে, ভাইবোনের সম্ভাষণে, শিশুর দেহে মাতার সোহাগচুম্বনের মধ্যে, রবির আলোতে, পাখির কলতানে সর্বত্রই কবি আপনাকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে এক আনন্দরস পানের মাদকতা অনুভব করেছেন।

যে দিকে চায় আঁখি সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে।
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখিধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

—প্রভাত-উৎসব

জগৎব্যাপী আনন্দময় বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র উপাদানের সঙ্গে আপনার অনুভূতিকে একাত্ম করে সীমাহীনতার আনন্দ আস্বাদনের পরিচয় প্রভাত-সংগীতের প্রায় সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।
প্রভাত-আলো সাথে ছড়াই প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

—প্রভাত-উৎসব

প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।

—স্রোত

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।…

মেঘের মতো হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়।

—সাধ

জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নে রে, কাছে আয়, আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

—সমাপন

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জীবনের অখণ্ডতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি একটি সংগতির সুষমা আবিষ্কার করেছেন। বিশ্বজোড়া ক্ষুদ্র প্রাণগুলির ঐক্যতানের মধ্যে মানবজীবনের হাসিকান্না ভালোবাসাবাসিরও একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। তাই যেমন কবি তারার সঙ্গে আকাশভ্রমণে বের হয়েছেন, লতার নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিয়েছেন, বায়ুর সঙ্গে ফুলের কাছাকাছি ঘুরেছেন, তেমনি আবার শিশুর প্রতি মাতার স্নেহধারায়, দুঃখীর ক্রন্দনে, সুখীর সংগীতেও আপনার উপস্থিতি অনুভব করেছেন।

মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।

—স্রোত

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংগতির সুষমা আবিষ্কার করলেও কবির কাছে সৃষ্টির বিচিত্র অভিব্যক্তির পশ্চাতে এক অসীম স্রষ্টার উপলব্ধি এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিতে কবি একটা নূতন রোমানটিক আনন্দের উৎস খুঁজে পেয়েছেন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আনন্দের যোগটি কবিচিত্তে অধীর আবেগ এনে দিয়েছে। কিন্তু আনন্দময় সৃষ্টির অন্তরীক্ষে আনন্দস্বরূপ সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করার মতো মানসিক প্রশান্তি তাঁর আসেনি। মহাস্বপ্ন, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় প্রভৃতি কবিতায় সৃষ্টি ও স্রষ্টার যোগসূত্রের তত্ত্বটি তাই শুষ্ক তত্ত্বই রয়ে গেছে; পরিপূর্ণ কাব্যরূপ ধরে আমাদের চিত্তকে নাড়া দিতে পারেনি। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে

এইসব নবলব্ধ অনুভূতিগুলি ছাড়াও জীবনদেবতা-রূপ কবির একটি বিশেষ কাব্যদর্শনের সূচনা প্রভাতসংগীতে আছে, কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে সে প্রসঙ্গের অবতারণা অবান্তর।

এতগুলি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও প্রভাতসংগীতের সাহিত্যিক মূল্য তার ঐতিহাসিক মূল্যের বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, 'প্রভাতসংগীতে এ সমস্ত লেখার আর কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়'।[১] এর একটা বিশেষ কারণ আছে। সন্ধ্যাসংগীতের যুগে যে বিষাদ কবির প্রকৃতিউপভোগের অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, প্রভাতসংগীতে তার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন। এই সদ্য বিষাদমুক্তির প্রতিক্রিয়ায় কবির কৈশোরের ভাবাবেগ উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করতে হলে যে মানসিক নির্লিপ্ততা, যে উদার প্রশান্তি প্রয়োজন, কিছুটা বয়সের ধর্মে কিছুটা অতীত জীবনের প্রতিক্রিয়ার ফলে সে নির্লিপ্ততা সে প্রশান্তি কবির এখনও আয়ত্ত হয়নি। প্রথম আস্বাদনের আনন্দে কবি আত্মহারা ভ্রমরের মতো কেবল সৌন্দর্যের ফুলে ফুলে নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন, জীবনের মধুসঞ্চয়ের কথা তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। নিজকে সংযত করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গভীরতর রহস্যের মহলে তিনি অভিসার করেছিলেন আরও পরে কড়ি ও কোমল এবং মানসীর যুগে। এ যুগে কবি 'ভাষাভারতীর প্রসাদ'ও লাভ করেননি। আপনার অস্পষ্ট অনুভূতির বাহন হয়েছে 'গদ্‌গদ ভাষী' প্রকাশভঙ্গি। কবির জীবনস্মৃতিতে বলেছেন,

'কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলেনা তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্য রচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের

১ কবির ভণিতা, প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো।...শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই।

—জীবনস্মৃতি, কারোয়ার

তথাপি ঐতিহাসিক বিচারে প্রভাতসংগীতের বিশেষ স্থান স্বীকার না করে উপায় নেই।

সন্ধ্যাসংগীতে আমরা দেখেছি প্রকৃতির চিত্রসৌন্দর্যের চেয়ে তার সাংগীতিক আকর্ষণই কবির কাছে বড়ো। প্রভাতসংগীতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চিত্রসৌন্দর্য উপভোগের জন্য যে দূরত্বটুকু প্রয়োজন প্রকৃতির সঙ্গে শিশুসুলভ মাখামাখি তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রভাতআকাশের শান্ত নীলিমার চেয়ে আকাশভরা পাখির গানই কবিকে মুগ্ধ করেছে বেশি। অনাস্বাদিত রহস্যও সংগীতের সুরেই তাকে আহ্বান করেছে।

ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখি
এখনো যে পাখি জাগেনি,
ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
উঠিবে বিভাস রাগিণী।
জগৎ-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি।

—আহ্বান-সংগীত

সংগীতরূপী প্রকৃতিকে উপলব্ধির ব্যাকুলতায় কবি পাখির গানকে শুধু কান দিয়ে মন দিয়ে নয়, দেহ দিয়েও উপভোগ করেছেন।

প্রভাতকরে করি রে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখির গান লাগে রে যেন
দেহের চারিপাশে।

—সাধ

প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যলাভে এখানে তিনি ইংরেজ কবি কীটসের মতো আবেগময়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিহারীলালের কাব্যেও প্রকৃতির সঙ্গে দৈহিক উপভোগের আবেগ ও আনন্দের বর্ণনা রয়েছে।

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি-রমণী সনে,
যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে।...
হেলিয়ে স্তবক-ভরে,
মরি কত লীলা করে,
পয়োধর ভার ভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।

—সংগীত-শতক, ৯৯

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ-ধরনের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ শিশুবয়স থেকেই যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর নারীপ্রেমেও যেমন প্রকৃতি উপভোগের আবেগের মধ্যেও তেমনি ইন্দ্রিয়ানুগ উচ্ছলতা সযত্নে বর্জিত হয়েছে।

৩

নবলব্ধ যে বিশ্বাসের ফলে প্রকৃতির আনন্দের মহলে কবির আহ্বান এসেছিল, সেই নূতন বিশ্বাসেরই নাট্যরূপ দিয়েছেন কবি এই যুগের নাট্যকাব্য প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ। কোনো নির্বিশেষ সাধনার মধ্য দিয়ে অসীমের উপলব্ধির ব্যর্থতা এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ড তুচ্ছতা এবং প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের বিশেষ উপলব্ধির পথেই অসীম আমাদের মনে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষাতে বলি,

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামের নরনারী, তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আরএক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক

অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল, এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।...আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।

—জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর বক্তব্যটি এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কবির সমগ্র কাব্যদর্শন এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এই অনুভূতির রঙেই অনুরঞ্জিত।

ছবি ও গান

অসীম ও সীমার সম্বন্ধ এবং জীবন ও মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্নতা আবিষ্কারের পর প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদনের পথে আর যখন কোনো অন্তরায় রইল না তখনকার কাব্য ছবি ও গান। প্রভাতসংগীতে তবুও মাঝে মাঝে অনন্ত জীবন, অনন্ত মৃত্যু এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারার স্বপক্ষে কবিকে ওকালতি করতে হয়েছে। কিন্তু ছবি ও গান শুধু উপভোগেরই কাব্য, এখানে তাত্ত্বিক ধারণার পক্ষ সমর্থনের পরিচয় নেই। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কবি কেবল হৃদয়ের পরিতৃপ্তির সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এই আনন্দের মধ্যে প্রভাতসংগীতের মতো অধীর ভাবাবেগ নেই তা নয়।

ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।...
উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আনমনে।
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনকুসুম প্রাণ বিকশিত,
কুসুমের 'পরে ফেলিব চরণ
যৌবনমাধুরী ভরে।
চারিদিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে।

—জাগ্রত স্বপ্ন

এমন কি এই আনন্দের আতিশয্যে মাঝে মাঝে কবির বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে এসেছে। প্রভাতসংগীতে যেমন দেহ দিয়ে তিনি পাখির গান উপভোগ করেছিলেন, এখানেও ফুলের গন্ধ তাঁর দেহে তেমনি পুলক জাগাচ্ছে।

বসন্ত-বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদু বাস।

—জাগ্রত স্বপ্ন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নীরব উপাদানগুলিও মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে, ফুলের গন্ধ সংগীত হয়ে তাঁর শ্রবণে সুধা ঢেলে দিচ্ছে।

অজানা ফুলের সুরভি মাখানো
স্বরসুধা করি পান।
—জাগ্রত স্বপ্ন

কিন্তু এই ভাবাবেগের, এই সংগীতময় ব্যাকুলতার পরিচয় ছবি ও গান কাব্যে অপেক্ষাকৃত কম। চিত্রকরসুলভ নির্লিপ্ততা কবির কাব্যপ্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এই হিসাবে ছবি ও গান-এর মূল্য প্রচুর। ভাষায় আঁকা কবির এই ছবিগুলি পরিণত চিত্রের গৌরব পেতে পারে একথা বলিনে, কবিও এই প্রয়াসগুলির অপরিণত রূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলি রঙ ছড়াইয়া পড়িত'।[১]

'ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয়নি তো'। ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয়নি বলেই মাঝে মাঝে ছবিতে গানেতে মেশামেশি হয়ে গিয়েছে। তবুও এই ছবি আঁকবার প্রয়াস অনেক স্থলেই সফলতার এবং অসামান্য সম্ভাব্যতার পরিচয় বহন করে।

একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।
ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা
চুলেতে করিছে ঝিকিমিকি।

১ জীবনস্মৃতি, ছবি ও গান।
২ কবির মন্তব্য, ছবি ও গান। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড।

কে জানে কি ভাবে মনে মনে
আনমনে চলে ধিকিধিকি।
পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
এত সোনা কে কোথা দেখেছে।
তারি মাঝে মলিন মেয়েটি
কে যেন রে এঁকে রেখেছে।

—একাকিনী

নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে
নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা,
কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,
বায়ু বহে যায় সুধাঢালা।
নীল আকাশেতে নারিকেল-তরু,
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে,
প্রভাত আলোয় কুঁড়েঘরগুলি
জলে ঢেউগুলি উঠে পড়ে।

—গ্রামে

এই চিত্রগুলির প্রকাশভঙ্গিতে অপরিণতির চিহ্ন বর্তমান, তবু ছবি আঁকবার নেশাটি বেশ স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। শুধু যে আনন্দময় দৃশ্য, প্রভাত সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নারাত্রির অতিস্পষ্ট মাধুরীটুকুই কবির তুলিতে ধরা পড়েছে তা নয়, অন্ধকার রাত্রির রহস্যময়তার সুন্দর চিত্রও কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে।

শুব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখ।
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথ-বায়,
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দুএকটি তারা পড়িতেছে খসি।

—নিশীথচেতনা

৩

রোমানটিক কবিদের একটি বিশেষত্ব হল এই যে তাঁরা মাঝে মাঝে তাঁদের উপভোগের সাক্ষাৎ বস্তুটিতে পরিতৃপ্তি খুঁজে পান না, তাকে অবলম্বন করেও তাকে ছাড়িয়ে অতীতের বা সুদূরের অন্য বস্তুতে চলে যান। এই রোমানটিক ব্যাকুলতার প্রভাবে কবি ছবি ও গান-এ বহুক্ষেত্রে আপনার প্রাকৃতিক পরিবেশ অতিক্রম করে অতীতের তপোবনে, সরযূর তীরে, তরুর ছায়ায় হরিণশিশুর চপল সঞ্চরণের মধ্যে মানসভ্রমণ করে এসেছেন।

ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।··
যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুমশয়নে আধেক মগনা,
বাকলবসনে আধেক নগনা,
সুখদুখ-গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।

—জাগ্রত স্বপ্ন

বুঝিরে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষিবালিকারা,
পরিয়া বাকল-বাস মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণশিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে,
মালিনী বহিত পদতলে,···
লুকিয়ে গাছের আড়ে সাধ যায় শুনিবারে
কী কথা কহিছে মেয়েগুলি।

—মধ্যাহ্নে

একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য যে কবিকল্পনার এই প্রাকৃতিক পরিবেশে অধিকাংশই কালিদাসের কাব্য থেকে সংগৃহীত। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কালিদাস রবীন্দ্রকাব্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সে প্রভাব তাঁর প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের মধ্যে কি রকম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তার পরিচয় আমাদের কৌতূহলের সামগ্রী। পরবর্তী কালে কল্পনা প্রভৃতি কাব্যে এই বিশেষত্বটি পরিণত রূপ নিয়েছে।

৪

ছবি ও গানে-এ কবির প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে একটা রোমানটিক বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। এই বিষাদ রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে একটি নূতন ধারার সূচনা করছে। আনন্দময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কবি সহসা একটি শূন্যতা আবিষ্কার করেছেন। সে শূন্যতা নারীর প্রেমের অভাবজনিত। যৌবনের প্রারম্ভে নারীপ্রেমের অভাববোধ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মিলনের মধ্যেও বিরহের সুর বাজিয়েছে।

কেহ কি আমারে চাহিবে না ?
কাছে এসে গান গাহিবে না ?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা ?
চাঁদের আলোতে, দখিন বাতাসে,
কুসুমকাননে বাঁধি বাহুপাশে
শরমে সোহাগে মৃদু মধু হাসে
জানাবে না ভালোবাসা ?…
আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে ?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে।

—জাগ্রত স্বপ্ন

কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে যৌবনের আবেগে নারীপ্রেমের আস্বাদ লাভের জন্য কবিচিত্তের আকাঙ্ক্ষা যতই প্রবল হোক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেমের মধ্যে তাঁর এ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটেনি। বিশেষ প্রেমের মধ্য থেকে কবি চিরকালই নির্বিশেষ প্রেমের দিকে যাত্রা করেছেন। তাই যদিও নারীসান্নিধ্যের বর্ণনা ছবি ও গান-এ নেই তা নয়, তবুও সে নারী ছায়ারাজ্যের লীলাসঙ্গিনী।

সাধ যায় বাঁশি-করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে।
সহসা দেখিব তারে, নিমেষেই একেবারে
প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন,
এই মরীচিকাদেশে দুজনে বাসরবেশে
ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ।
বাঁধিবে সে বাহুপাশে চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
মুখে তার হাসির মুকুল,
কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলোচুল।
—মধ্যাহ্নে

রবীন্দ্রনাথের নারীপ্রেমের আদর্শ আমাদের আলোচ্য নয়, তবু আনন্দময় প্রাকৃতিক পরিবেশে এই নারীপ্রেমের তৃষ্ণা জেগেছে বলেই এ আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

প্রভাতসংগীতে আমরা দেখেছি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবির প্রাণে এক গভীর আনন্দের উপলব্ধি জেগেছে, কিন্তু উপলব্ধির মধ্যে যে উন্মাদনা ছিল ছবি ও গান-এ তা শান্ত হয়ে এসেছে।

বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,

নয়নকিরণে তোর ফুলিবে পরাণ মোর
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।

—স্নেহময়ী

এই আকাঙ্ক্ষাই আরও গভীর অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোনার তরী পর্বে কবির কাব্যকে অপূর্বতা দান করেছে।

কড়ি ও কোমল

কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন, 'আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে'।[১] অতি সূক্ষ্ম বিচারে এই উক্তিটিকে অনেকে অবশ্য সম্পূর্ণ মেনে নিতে চাননি, কিন্তু সাধারণভাবে এ কথার সত্যতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। আমাদের আলোচনায় এ উক্তির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। ছবি ও গান-এ দেখেছি প্রকৃতির অন্তরঙ্গতার মধ্যে কবির মনে নারীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষার বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছে। কড়ি ও কোমল কাব্যে সে আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব বিকাশ। কিন্তু এ বিকাশের পরিচয় আমাদের আলোচনার গণ্ডির বাইরে। কিন্তু কড়ি ও কোমল-এর যুগেই কবি সর্বপ্রথম সচেতন ভাবে মানবজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। মানুষের সান্নিধ্যে কবির অন্তরে যে আনন্দের সূচনা তারই বহিঃপ্রকাশ এ কাব্যের প্রথম কবিতাটিতেই আছে।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—প্রাণ

কবি এখন আর শুধু সুন্দর ভুবনের প্রাকৃতিক সম্পদের অজস্রতার মধ্যে তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দের তৃষ্ণা মিটাতে পারছেন না, এই সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের স্পর্শটিও তাঁর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে তাঁর অভিজ্ঞতার নূতন সঞ্চয়ের মধ্যে বেদনার অংশও রয়েছে প্রচুর।

১ জীবনস্মৃতি, বর্ষা ও শরৎ।

শুধু প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে জীবন ও মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য সংযোগের সূত্রটি আবিষ্কার করে কবি যে আনন্দের মুহূর্তগুলি আহরণ করছিলেন, মানবজীবনের দিকে সচেতন দৃষ্টিপাতের ফলে তার আনন্দের অংশে বেদনাও এসে মিশল। তার একটি বিশেষ কারণও ছিল। নিজের পারিবারিক জীবনের মধ্যে মৃত্যুর আবির্ভাব এসময়ে কবির চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'কড়ি ও কোমল-এ যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমল-এই তার প্রথম উদ্ভব'।[১] মৃত্যুকে এত কাছাকাছি এত নিবিড় করে কবি এর আগে আর উপলব্ধি করেন নি। জীবনমৃত্যুর দার্শনিক তত্ত্ব এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিসমাপ্তির অস্বীকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ বাণী। সুতরাং কড়ি ও কোমল-এর যুগের এই মৃত্যুগুলিকে তিনি অত্যধিক প্রাধান্য দিতে পারেন না, তবুও এত ঘনিষ্ঠভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের বেদনা দীপ্ত আনন্দের সঙ্গে মিশে সজল বর্ষামেঘের মতো তাঁর মনের আকাশে বিচিত্র রামধনু-রঙ সৃষ্টি করেছে। এ কাব্যের মূল রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যের রসোচ্ছ্বাস।

> আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
> ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
>
> —যৌবন-স্বপ্ন

কিন্তু বিষাদের অনুভূতি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের দীপ্তিটুকু আড়াল করে দিয়েছে।

> এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়
> কিছুতে পারে না বাঁধিয়া রাখিতে।
>
> —মোহ

১ কবির মন্তব্য, কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড।

আনন্দোচ্ছ্বাসের সুউচ্চ কড়ি, আর বেদনার গভীরতর কোমল গ্রামের মিলনেই কড়ি ও কোমল কাব্য। অতি প্রিয়জন বিয়োগের দারিদ্র্যবেদনায় কবি কাঙালিনী মেয়ের মতো ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন আনন্দউৎসবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শুধু করুণ নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন, ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর কবিদৃষ্টিতে ক্ষণকালের জন্য যতোই বেদনা মিশিয়ে দিক, এই সচেতন দৃষ্টিপাত তাঁর ভবিষ্যৎ কবিজীবনের একটি বিশিষ্ট কাব্যদর্শনের সূচনা করেছে। এতো দিন বিশ্বপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে যে সংগতির সুষমা কবিকে আনন্দ দিচ্ছিল, আজ সে সংগতিতে মানুষেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান তিনি আবিষ্কার করলেন; স্রষ্টা এবং সৃষ্টির যুগল উপাদান প্রকৃতি ও মানবজীবন জড়িয়ে কবির যে গভীর ও ব্যাপক মিষ্টিক দৃষ্টি তারই সূচনা হল।

২

কড়ি ও কোমল কাব্যের অন্য আরও একটি নূতন সুরের সম্বন্ধে কবি বলেছেন, 'বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যালোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমল-এ কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে'।[১]

এটি রূপক উক্তি। এর পূর্বের কাব্যগুলিতে বর্ষার রূপ এমন কিছু প্রাধান্য পায়নি। বর্ষারও একটি চিত্ররূপ আছে। কিন্তু এতো দিন বর্ষার ঘনমেঘসম্ভারে এবং নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের মধ্যে কবি কেবল সংগীতের মাধুর্যই শ্রবণ করেছেন। আজ শরতের মেঘ আর রৌদ্রের খেলায় প্রকৃতির চিত্ররূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। পরবর্তী যুগে বর্ষাকেও তিনি চিত্ররূপে উপস্থাপিত করেছেন। কড়ি ও কোমল কাব্যে অবশ্য শরৎবর্ণনাও আছে।

১ জীবনস্মৃতি, কড়ি ও কোমল।

চারিদিকে প্রভাতের আলো,
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
—কাঙালিনী

আজি শরৎ-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়॥
—আকাঙ্ক্ষা

কিন্তু এধরনের রোমানটিক শরৎবর্ণনাই কবিজীবনের শরতের আগমনীর মূলকথা নয়। ভাবাবেগের বায়ু এবং বাষ্প তাঁর মনের আকাশে আর বর্ষার মায়া সৃষ্টি করছে না, তাঁর মনের আকাশে শরতের প্রভাব জেগেছে যে শরতে আছে রৌদ্র ও মেঘের হাসিকান্না, আর সর্বোপরি আছে চিত্রদর্শনের উপযোগী একটি নির্লিপ্ততা। ছবি ও গান-এর চেয়ে প্রকৃতির চিত্ররূপ অঙ্কনে কড়ি ও কোমল কাব্যে কবির দক্ষতা অনেক পরিমাণে বেড়েছে।

পথের ধারে অশথ-তলে
মেয়েটি খেলা করে;
আপন মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধরে।
উপর পানে আকাশ শুধু
সমুখ পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে
মধুর পথঘাট।...
মাথার 'পরে ছায়া পড়েছে
রোদ পড়েছে কোলে,

পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে।
মাঠের থেকে বাছুর আসে
দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠবিড়ালি উস্কখুস্ক
আশেপাশে ছোটে,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে
চমক খেয়ে ওঠে।

—খেলা

বেলা বহে যায় চলে— শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ান,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ান।

—কল্পনা-মধুপ

এখানে যদিও সন্ধ্যার অবসন্ন অবকাশে কবি বাঁশরির তান শুনেছেন তবুও চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস এবং সফলতা এখানে অসামান্য।

জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী,
আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা।
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিত রাগিণী।
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি।

—রাত্রি

মানসী

মানসী কাব্য বহুদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথের পরিণত সৃষ্টির প্রথম নিদর্শন। ছন্দ এবং বাচনভঙ্গির বিশিষ্টতায় এই কাব্যটি তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম দিগ্‌দর্শনী। প্রকৃতিপ্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তিতেও মানসীর গৌরব অপরিসীম। প্রকৃতির চিত্ররূপ অঙ্কনের যে প্রতিভা ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল-এ দানা বেঁধে উঠছিল মানসীতে তার পরিণতি আরও গভীর।

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরে থরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোত যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে ;
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীর তলে ধীর গতি অলস মায়ায়।

—মরণস্বপ্ন

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা।
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডু-কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা
আম্রবন তাম্র-ফলময়।

গোলকচাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে
বন হতে আসে বাতায়নে,
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দুরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে-ধু ধু,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া;
তারি প্রান্তে উপবন মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুলগন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটিরখানা দুধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ;
তারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।

—কুহুধ্বনি

কিন্তু শুধু চিত্ররূপী নয়, সংগীতরূপী প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম পরিচয়ও মানসীতে পরিণতি লাভ করেছে, অপরিণত বয়সের ভাবোচ্ছ্বাস সংযত হয়ে এসেছে।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এখন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

—বর্ষার দিনে

এখানে বর্ষাবর্ণনার চিত্রসম্ভার কত অল্প, কিন্তু তবুও বর্ষার নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের দিনে একটি অলসক্ষণের আবেশটুকু কি চমৎকার ধরা পড়েছে। বর্ষার এই দেহহীন ভাবময় রূপটি সংগীতের মাধুর্যে আমাদের হৃদয় অধিকার করে।

একই বর্ণনায় সংগীত এবং চিত্ররূপের সংমিশ্রণ শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রতিভার পক্ষেও একটি দুর্লভ সামগ্রী। মানসীতে সে দুর্লভ সাফল্যও রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছেন।

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।'
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহ কোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল'।

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু ধু,
ডাইনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

—বধূ

এই উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকটি সম্পূর্ণরূপেই চিত্রধর্মী। কিন্তু প্রথম স্তবকের 'জলকে চল' আহ্বানের পর এই চিত্রগুলিতে মন নিবিষ্ট হবার আগেই আমরা এই দৃশ্যসম্পদের মধ্য থেকে একটা সাংগীতিক আনন্দ আহরণ করতে পারি। কিন্তু আর একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করে দেখলে বর্ণনাটির দুর্লভ চিত্রসম্পদ্‌ও চোখে পড়ে।

২

মানবজীবনের সম্বন্ধে যে সচেতনতা কড়ি ও কোমল কাব্যে কবির প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বেদনা মিশিয়ে দিয়েছিল, তারই ফলে মানসীতে কবি মাঝে মাঝে প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ দেখেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড জীবনের

মধ্যে মানুষের প্রকৃত স্থানটি বিষাদের ঘনকুয়াশায় আড়ালে পড়ে গিয়েছে, তাই মানুষের খণ্ড সুখদুঃখকে প্রকৃতির নির্লিপ্ততার সঙ্গে তুলনা করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ ফেনায়িত হয়ে উঠেছে।

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি।
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরিতি!
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি।

—প্রকৃতির প্রতি

এমনকি এই নির্লিপ্ততাকে, মানুষের সুখদুঃখের প্রতি এই উদাসীনতাকে কবি জড়ত্ব বলেও অভিহিত করেছেন।

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্রকোলে,
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।

—সিন্ধুতরঙ্গ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির জড়ত্ব কল্পনার কোনো সংগতি নেই। এটা একটা ক্ষণিক অনুভূতি। এই অনুভূতিটি তাঁর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেনি। তবে প্রকৃতির উদাসীন, জড় এবং হিংস্র রূপ আঁকতে গিয়ে প্রকৃতির যে রুদ্ররূপ ফুটে উঠেছে তা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যগুলিতে ক্রমবর্ধমান সাফল্য লাভ করেছে।

৩

প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের মধ্য থেকে কি করে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে নারীর প্রেমসাহচর্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন সে কথা আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু শুধু কামনাগন্ধি বাহু মিলনে পরিসমাপ্ত প্রেম কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেনি, তার প্রেম একটা বিদেহী অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। মানসীর কয়েকটি কবিতায় কামনাপূর্ণ প্রেমাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কবির অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। শুভ্র শতদলের মতো মানুষের পবিত্র সাহচর্যও বাসনাময় প্রেমের অধিগম্য নয়।

জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?

—নিষ্ফল কামনা

কামনাগন্ধি প্রেম রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঞ্চয় নয়। প্রকৃতির প্রেম থেকে যে নারীপ্রেমের উদ্ভব হয়েছিল, সেই ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ প্রকৃতির দেহে সৌরভ হয়ে মিশেছে, নারীপ্রেম তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৈহিক বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে।

চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তাহলে
আমার বিদায়ের শেষ-চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার

নিদ্রাতুর আঁখি 'পরে ;— সারারাত্রি ধরে
তোমার সে জনহীন বিশ্রাম-শিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে।

—বিদায়

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।...
খুলে দাও কেশভার ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে।
রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।

—সন্ধ্যায়

তারি ভালোবাসা তারি বাহু সুকোমল
উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্তবাতাস।

—মানসিক অ৷ভসাব

নারীসৌন্দর্যের উপাদানকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপকে উপস্থাপিত করে তাকে উপভোগ করার যে রীতি, এখানে তার পরিচয় নেই। নারীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন প্রকৃতির দেহে লীন হয়ে গেছে। প্রকৃতির মধ্য থেকে কবি তারই অদেহী স্পর্শ অনুভব করছেন, নিজের কামনাগুলির স্থূলতাও প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় মিলিয়ে গেছে। তাঁর কাব্যে ভগবানের স্পর্শও এসেছে প্রকৃতির

শোভাসম্পদের মধ্যস্থতায়। তাই প্রকৃতিরূপী লীলাসঙ্গিনী, নারী এবং ভগবানের প্রেমের স্বাতন্ত্র্য খুব স্পষ্ট নয়। এক প্রেমের অন্য প্রেমে রূপান্তর তাঁর কাব্যে তাই এত সহজে হয়েছে।

৪

প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মিস্টিক অনুভূতির আভাস মানসীতে কিছু কিছু আছে।

নিশীথ-আকাশমাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা,
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহাঅন্ধকার ওহে মহাজ্যোতি
অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ।

—জীবন-মধ্যাহ্ন

কিন্তু সর্বত্র এই আভাসটি জ্যোতির্ময় অসীম সত্তার নয়। মাঝে মাঝে নারী আর ভগবানের মধ্যে সীমারেখাটি আবিষ্কার করা কঠিন।

কে জানে একি ভালো?
আকাশভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপনতারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো,
কে জানে একি ভালো?

—আশঙ্কা

বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিচিত্রতার থেকে নিবিষ্ট মনের অন্তঃপুরবাসিনী যে নারীর প্রেমানুভূতির দিকে কবি যাত্রা করেছেন, তিনিই কবির 'মানসী'। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তিনি প্রায় অভিন্ন। প্রকৃতির লীলাসঙ্গ, নারী প্রেমের অদেহী সৌরভ, আর ভগবানের স্পর্শ সব কিছু মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথের মানসী গড়ে উঠেছে।

প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের স্পর্শ, পার্থিব শোভাসম্পদকে অতিক্রম করে এক অসীম সত্তার সন্ধান প্রথম অনুভূতির প্রেরণায় কবিচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। যে উপাদানগুলি তাঁকে এই নূতন অনুভূতির পথে পরিচালিত করেছিল তাদেরও তিনি মাঝে মাঝে অস্বীকার করতে চেয়েছেন।

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ
গ্রহ তারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূর দিশি,…
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও
মাগিতেছি অকপটে,
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ চিত্রপটে।
—সুরদাসের প্রার্থনা

বাহ্যিক উপকরণের দ্বারা মন যেখানে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সেখানে উপকরণের অতিরিক্ত কোনো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে আসে। সুতরাং 'বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে' তিনি সেই উপকরণের অতিরিক্ত অসীম আনন্দ লাভের প্রয়াস করেছেন। কিন্তু এ প্রয়াসও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চিরন্তন সত্য নয়। প্রকৃতির বাহ্যিক উপাদান তাঁর কাছে প্রকৃতির অন্তস্তলের নির্বিশেষ সত্তার মতোই সত্য। বিশেষ একটি ঋতুতে শুধু একজন তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ধরা দিয়েছে। কোনো একটির বিচারেই তাঁর সমগ্র কবিজীবনের গভীর, বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যাবে না। জীবনের বিভিন্ন পর্বে পাওয়া নূতন নূতন অনুভূতি কবির নূতনতর অনুভূতির পথে পথে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সমস্ত অনুভূতিকে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস সমগ্র রূপ পেয়েছে তার মধ্যে সৃষ্টি স্রষ্টাকে অন্তরাল করে রাখেনি, স্রষ্টাও সৃষ্টির থেকে নির্বিশেষ কিছু নয়।

প্রকৃতির সহস্র বিকাশের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকার আনন্দ, আর তাকে অতিক্রম করে ভগবানের অসীমত্বের অনুভূতি দুই-ই রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের উপাদান। যে 'আকাশচিত্রপটে' 'তিমিরতুলিকা' বুলিয়ে দেবার জন্য মানসীতে কবিকণ্ঠের অনুরোধ ধ্বনিত হয়েছিল, পরবর্তী চৈতালি, কল্পনা ইত্যাদি কাব্যে সেই আকাশচিত্রপটকেই কবি নূতন আনন্দে উপলব্ধি করেছেন।

৫

প্রকৃতির মাতৃরূপ দর্শন প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার স্বাভাবিক পরিণতি। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে গভীরতা এবং সৌন্দর্য রূপ পেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এই মাতৃরূপা প্রকৃতির প্রথম চিত্র মানসী কাব্য গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কবি এখানে পৌরাণিক অহল্যা-উপাখ্যানের সাহায্যে প্রকৃতির এই নূতন রূপের অভিব্যক্তি দান করেছেন। স্বামিশাপে অহল্যা পাষাণরূপ গ্রহণ করে পৃথিবীর অঙ্গে মিশেছিলেন। সেই অঙ্গস্পর্শ থেকে তিনি পৃথিবীর মাতৃহৃদয়ের মূক চেতনার অংশ সঞ্চয় করেছেন।

আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা মাঝে ?...
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ?

—অহল্যার প্রতি

দীর্ঘ অভিশপ্ত দিনগুলির শেষে অহল্যা প্রকৃতির দেহ থেকে সঞ্চিত শোভায় সজ্জিত হয়ে 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো' আত্মপ্রকাশ করলেন, তাঁর দেহে প্রকৃতির স্পর্শ তখনও লেগে রয়েছে।

হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে,
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে— পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন— এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।
—অহল্যার প্রতি

এখানে উপাখ্যান এবং রূপকের অন্তরালে যে গভীর বিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে সোনার তরী পর্বে তার পূর্ণতর বিকাশের পরিচয় পাব।

৬

সংস্কৃত সাহিত্য এবং বাংলা বৈষ্ণবকাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল একথা আলোচনা করেছি। মানসীতে বহু স্থানে জয়দেব এবং কালিদাসের কাব্যে রচিত পটভূমিকে কবি স্মরণ করেছেন। আপনার বিরহী হৃদয়ের অনুভূতি বর্ণনায় কবি বিরহিণী রাধিকা ও যক্ষনারীকে না ভেবে থাকতে পারেননি। অবশেষে আপনার আত্মকেন্দ্রিক বিরহকে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে চিরন্তন এবং অসীম বিরহের আস্বাদ লাভ করেছেন।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবাঅভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে॥···

যক্ষনারী বীণাকোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষকেশ,
অযত্নশিথিল বেশ ,
সেদিনো এমনতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

—একাল ও সেকাল

প্রথম অংশের রাধিকার দিবাঅভিসারের পটভূমি সাধারণভাবে সমস্ত বৈষ্ণবকাব্যের হলেও যেন বিশেষ করে জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ

শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ'[১] স্মরণ করিয়ে দেয়। যক্ষনারীর বর্ণনা কালিদাসের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য, নিক্ষিপ্য বীণাং মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা'[২]র ভাবানুসারী। বৈষ্ণবকবিতার বিশেষ করে গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য আরও আছে। বর্ষার দিনে

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন-অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছল ছল নলিন-নয়ন।
—পত্র

মেঘদূতপ্রশস্তিতেও রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের বর্ষাবর্ণনার কথা ভুলতে পারেননি। উপরে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দ-এর প্রথম শ্লোকের 'মেঘৈর্মেদুরং' ইত্যাদি পংক্তির কথা সেখানেও স্মরণ করেছেন।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর একদিন বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।
—মেঘদূত

কিন্তু আপনার চারদিকের প্রত্যক্ষ পটভূমি থেকে কালিদাসের যুগে অভিসারের পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। মানসীতে শকুন্তলার প্রসঙ্গও এসেছে কুহুধ্বনিকে অবলম্বন করে।

লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখনো সে কুহুভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

১ গীতগোবিন্দ, প্রথম শ্লোক।
২ মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২৫।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই
শুনিয়া আকুল কুহুরব।

—কুহুধ্বনি

এই সকল বর্ণনার মধ্যে যে কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যোগ্য সেটা হল রবীন্দ্রনাথের রোমানটিক মনের একটি বিশেষত্ব। আপনার অনুভূতির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে সমস্ত কালের এবং সমস্ত মানবের মধ্যে তাকে বৃহত্তর করে উপলব্ধি করার যে আনন্দ কবিকে প্রেরণা দিচ্ছিল, তারই একটা বিশেষ উপাদান তিনি খুঁজে পেয়েছেন কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবর্ণনার সাদৃশ্য যতোই থাক, তাঁদের প্রেরণার উৎস অনেকটা ভিন্ন। কালিদাসের বর্ণনা বিশেষভাবেই আড়ম্বরপূর্ণ এবং তার কার্য প্রধানত কাব্যের উদ্দীপন বিভাবের সৃষ্টি করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি অন্যতম আলম্বন বিভাব। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের নিকটতম সাদৃশ্য মেঘদূত কাব্য। এ কাব্যটি যেন বর্ষার চিরন্তন রূপকে মানবের অসীম বেদনার সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ আপনার উপলব্ধ বর্ষাদৃশ্যের মধ্যে কালিদাসের কাব্যের চিরন্তন আবেদনটিকে খুঁজে পেয়েছে।

মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।...
সেদিনের পরে গেছে কত শত বার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে, করি বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা।

—মেঘদূত

এই কাব্যে সৃষ্ট বর্ষার পটভূমি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। কালিদাসের কবিপ্রতিভাকে প্রণতি জানাতে গিয়ে কবি সে যুগের সান্নিধ্যস্পর্শ লাভ করেছেন আপনার মনে। মেঘদূতের অন্তর্নিহিত বেদনার মধ্যে আজকের কবি আপনার নূতন প্রেরণার সংগতি খুঁজে পেয়েছেন বলেই মেঘদূতের পটভূমিও কবির কাছে আজকের প্রাকৃতিক পরিবেশের মতোই সত্য হয়ে উঠেছে। মেঘদূতের দৃশ্যসম্পদ্ আজকের লেখনীতে আবার সজীব রূপ ধারণ করেছে।

বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।

—মেঘদূত, পূর্বমেঘ ২৩

সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত; শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেমঅভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে।

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।

সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥

—মেঘদূত, পূর্বমেঘ ৩৭

এই কাব্যে কালিদাসের এবং জয়দেবের প্রাকৃতিক পটভূমিকে কবি শুধু স্মরণ করেছেন আপনার বিশেষ কোনো ভাবের সহায়ক হিসাবে। কিন্তু পরবর্তী কালে এঁদের কাব্যের পটভূমি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টির মতো। বর্ষাকাব্য রচনায় অনেক সময় সচেতনভাবে কালিদাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের স্মরণ না করেও তিনি তাঁদের যুগের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে বিচরণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরএকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রমানসের যে রোমানটিক প্রেরণা নিজের বিশেষ অনুভূতিকে সর্বকালে এবং সর্বমানবের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে, সে প্রেরণা প্রধানত বর্ষাঋতুকে অবলম্বন করেই অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে তাই শুধু আয়তনে নয় গভীরতায়ও বর্ষা ঋতুরই শ্রেষ্ঠত্ব।

সোনার তরী

পরবর্তী সোনার তরী কাব্যের সূচনাতেই একটি বর্ষাবর্ণনা। সে বর্ষায় কড়ি ও কোমল যুগের পূর্ববর্তী ভাবোচ্ছ্বাস নেই, আছে বর্ষার চিত্র- ও সংগীত-ময় রূপেব সংহত প্রকাশ।

একখানি ছোটো খেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা,
এপারেতে ছোটো খেত আমি একেলা।

—সোনার তরী

এখানে বর্ষার চিত্ররূপের শ্রেষ্ঠত্ব না সংগীতরূপের শ্রেষ্ঠত্ব একথা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চিত্র এবং সংগীত পরস্পরের পরিপূরক হয়ে একটি সৌন্দর্যময় অখণ্ডতায় আপনাদের লীন করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে সোনার তরী কাব্যের সফলতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের পূর্ণতম পরিণতির পরিচয় বহন করছে। অনুরূপ সফলতা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের পক্ষেও দুর্লভ একথা পূর্বেই বলেছি। দুর্লভ সাফল্য সোনার তরী কাব্যে বহুবার ধরা দিয়েছে।

বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্নবাতাসে ; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম। …
চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগে
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ড মেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।…
বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তরমাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে

একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।

—যেতে নাহি দিব

২

শুধু প্রকৃতিবর্ণনায় নয়, প্রকৃতির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও সোনার তরী পূর্ণতম পরিণতির কাব্য। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে পদ্মানদীর প্রভাব হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে। এই পদ্মার থেকেই কবি আপনার কবিধর্মের সচল রূপটির সন্ধান পেয়েছিলেন, এর তীরেই উদার বিশ্বপ্রকৃতির পরিপূর্ণ মাধুর্য উপলব্ধি করেছিলেন, আর এর তীরে তীরেই সঞ্চয় করেছিলেন মানবজীবনের চিরন্তন স্পর্শ। সোনার তরীর সূচনায় তাঁর এই নূতন প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে কবি বলেছেন,

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে এই যোগসূত্রটি সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা এর পূর্বেকার কাব্যসাধনায় নেই তা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে

সংশয় এসে তাঁর বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করেছে। এই সংশয়ের ফলেই মানবজীবনের সঙ্গে তুলনায় প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপটি তাঁর চোখে প্রকট হয়েছিল মানসী কাব্যে। পদ্মার বক্ষে অবকাশযাপনের ফলে তিনি যেমন আপনার কবিধর্মের প্রকৃত রূপটির সন্ধান পেলেন, তেমনি পেলেন আরএকটি বিশ্বাসের সংশয়হীন পরিণতি। এ-সময়ে কবি উদার প্রকৃতির মধ্যে বাস করেছিলেন। লোকালয়ের খুব কাছে অথচ ঠিক লোকালয়ের মধ্যে ছিলেন না বলেই প্রকৃতি ও মানবলোকের নিত্যসচল সম্বন্ধটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। লোকালয় থেকে খুব দূরে থাকলে হয়তো লোকালয়ের সুখদুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে অস্পষ্ট সংগীত হয়ে উঠত, আর লোকালয়ের মধ্যে থাকলে লোকালয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। লোকালয়ের বাইরে অথচ লোকালয়ের এত কাছে থাকার সুযোগ তাঁকে গভীর প্রেরণা যুগিয়েছিল সন্দেহ নেই। এই কাব্যে মানবের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্বন্ধের কথা, তাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সঙ্গে প্রকৃতির বৃহৎ এবং ব্যাপক সুখদুঃখানুভূতির যোগাযোগ যে রকম স্পষ্ট ভাষায় এবং গভীর অনুভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে' তার তুলনা বোধকরি সমগ্র জগতের সাহিত্যেও খুব বেশি নেই। কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কবির পিতৃহৃদয় যে দুটি কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়েছিল, তারই সুরে সমস্ত নিখিলকে অভিষিক্ত করে তিনি মানব ও বিশ্বপ্রকৃতিকে এক বেদনার সম্পর্কে যুক্ত করে দিয়েছেন।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব, যেতে নাহি দিব'। সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী

কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব নারে'!

—যেতে নাহি দিব

অন্যত্র শ্রান্ত এবং শান্ত সান্ধ্যপ্রকৃতির অসীমত্বের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি মানবজীবনের নিরবচ্ছিন্ন গতিরও আভাস পেয়েছেন।

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

—শৈশবসন্ধ্যা

মানসীতে প্রকৃতির মাতৃরূপ দর্শনের পরিচয় পেয়েছি। তবু মানবের দুঃখে নির্বিকার ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির চিত্র কবির অন্তরে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সোনার তরীতে কবি আবিষ্কার করলেন, প্রকৃতি নিষ্ঠুরা নয়, সে অক্ষমা দরিদ্রা। সন্তানের দুঃখ দূর করতে না পেরে সে নিজেই ব্যথায় ম্রিয়মাণা।

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
বেদনাকাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্ম্মমাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।

—দরিদ্রা

সোনার তরীতে প্রকৃতি ও মানবজীবনের আপাত বিরোধের সন্দেহটি দূর হয়ে যাওয়াতে প্রকৃতির মাতৃরূপের পরিচয় কবির গভীর অন্তরঙ্গতায় অভিষিক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে কবির বিশেষ সফলতার কথা পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা

করেছি। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সৌরভে গড়া দেহ কবি আবার প্রকৃতির সৌন্দর্যসঞ্চয়ের মধ্যেই নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছেন। কবি-হৃদয়ের অনুভূতি হয়তো প্রকৃতির সৌন্দর্যে নূতন একটি বিকাশের বর্ণ এঁকে দেবে।

আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে নাকি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ?
—বসুন্ধরা

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
—পুরস্কার

এর থেকে গভীরতর সুরে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার পরিচয় কোনো কবির বীণায় ধ্বনিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন আবিষ্কারগুলি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ডারউইন-প্রবর্তিত অভিব্যক্তিবাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। সৃষ্টির আদিতম উৎসে যে ক্ষুদ্র জীবনস্পন্দন ছিল তাই অভিব্যক্তির পথে বিকশিত হয়ে আজকের পূর্ণতর জীবনের সৃষ্টি করেছে। পুনরুজ্জীবনের যুগে এই মতবাদের তরঙ্গ ভারতীয় চিন্তাধারায় ও এসে লেগেছিল। সোনারতরীর সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা ইত্যাদি কবিতায় কবি অতীতজীবনের যে বিচিত্র স্মৃতি, বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্কে আপনার নবনব জন্মলোভের যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। যুক্তিপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে কবি আপনার অনুভূতিতে সত্য করে পেয়েছেন। আদিম জীবনস্পন্দনের সঙ্গে কবির নাড়ির টান এ-যুগের রচিত ছিন্নপত্রেও অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এই নাড়ির টান কবির প্রকৃতিপ্রেমকে গভীরতর করেছে।

৩

নারীর প্রেমকে প্রকৃতির সৌরভের মধ্যে স্থাপন করে তার মাধুর্য উপলব্ধি করেছেন কবি মানসী কাব্যে। সে নারী আর প্রকৃতি সোনার তরীতে এসে একসঙ্গে মিশে মানসসুন্দরীতে রূপ নিয়েছে। এই সুন্দরী কখনও বা নারীদেহ ধারণ করে কবির স্পর্শসীমার মধ্যে সজীব হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্ধনিমীলিত-আঁখি।
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দ ভরে
নির্ঝরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী

মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধপ্রাণ
নিঃস্তব্ধ শান্ত সন্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও তাই রব প্রিয়া।
—মানসসুন্দরী

কখনও আবার প্রকৃতির শোভার মধ্যে লীন হয়ে দূর থেকে কবিকে মুগ্ধ করেছেন।

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি, বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন;
শরৎপ্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্যছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালের বায়
বসন বয়ন কর বকুল তলায়;
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে

ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবরতীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মুলতান।
—মানসসুন্দরী

'গৃহের বনিতা' এবং 'বিশ্বের কবিতা'র এই অপূর্ব সংমিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির অন্যতম বিশেষত্ব। নারী এবং প্রকৃতির সমন্বয়ে গড়া এই লীলাসঙ্গিনীকে কবি কখনও তাঁর হৃদয়যমুনায় কুম্ভ ভরে নিতে আহ্বান করেছেন, কখনও বা গভীর ঝঞ্ঝানিশীথে তার সঙ্গে মরণদোলায় দুলেছেন, কখনও আবার তারই সোনার তরীতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। যৌবনের এই লীলাচঞ্চল মানসসুন্দরী কবির প্রৌঢ় অনুভূতির স্পর্শে বিশ্বদেবতা বা ভগবানের নিকট আপনার প্রাধান্য সংকুচিত করেছিলেন, তবুও মাঝে মাঝে কবির কাছে তার সুদূর আহ্বান এসে পৌঁছেছে। অবশেষে পূরবীতে এবং আরএক বার বীথিকা কাব্যে কবি এই মানসসুন্দরীর পরিপূর্ণ সঙ্গ লাভ করেছেন।

প্রকৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই কবি বিশ্বদেবতা বা ভগবানের স্পর্শ লাভ করেছেন একথারও আমরা উল্লেখ করেছি। প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতার প্রকাশের সত্তাটিকে কবি প্রধানত নটরাজরূপেই কল্পনা করেছেন, পরবর্তী বহু কাব্যে আমরা তার পরিচয় পাব। নটরাজের পরিকল্পনায় অতি স্বাভাবিক কারণেই মানসসুন্দরীর লীলাচপলতার পরিবর্তে একটি রহস্যময় গাম্ভীর্য আছে। সোনার তরীতে সে রহস্যময় গাম্ভীর্যের সুরও ধ্বনিত হয়েছে।

ওগো কে বাজায় বুঝি শোনা যায়
মহারহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর 'পরে বসিয়া
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল
গগনে গগনে জ্যোতিঅঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।
—বিশ্বনৃত্য

চিত্রা

চিত্রা কাব্যেও কবির লীলাসঙ্গিনীরই প্রাধান্য। শুধু আপনার অন্তরের প্রেয়সী করে নয়, বাইরের বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশের মধ্যস্থতায়ও তারই স্পর্শ এসে কবির অন্তরে প্রবেশ করেছে। তারই প্রশস্তি।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

—চিত্রা

কিন্তু এই বিচিত্ররূপিণী যখন কবির অন্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন বাইরের শোভাসৌন্দর্যের হাসিরূপগানের আভরণ তাঁর আর থাকে না, সুরদাসের মতো কবির রূপখোঁজা দৃষ্টিও তখন অন্তর্মুখীন হয়ে যায়।

একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চির-যামিনী।

—চিত্রা

বাইরের এই বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরের একাকিনী উভয়ের দরবারেই কবির সমান আমন্ত্রণ। কবির নিজের ভাষায় বলি। 'বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এবার ফিরাও মোরে কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্র ডাক পড়েছে। আবেদন কবিতায় ঠিক তার উলটো কথা। কবি বলেছে, কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে। জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য'।[১]

প্রকৃতির প্রেমের বিচারে এই দ্বৈতরূপিণী কি করে কবির জীবনকে প্রভাবিত করেছেন তার কথা আমরা আগেই বহুবার বলেছি। অন্তরের সঙ্গে

১ সূচনা, চিত্রা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড।

বাইরের এই সামঞ্জস্য বিধানের ফলে অন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়ার আনন্দ এবং বাইরের বিচিত্র জীবনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আনন্দ, দুইই কবিকে সমানভাবে আকর্ষণ করেছে। চিত্রা কাব্যে অন্তর এবং বাইরের বিরোধ অবসান হওয়াতে উপলব্ধির আনন্দে কবির সংশয়হীনতা এসেছে, তাতে আনন্দও মধুরতর হয়েছে।

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো : সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে ; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে ; অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে।

—সুখ

কখনও বাইরের সৌন্দর্যের অজস্রতা থেকে কবি নিজের অন্তরের একটি বিশ্বাসকে অতি সহজ করে পেয়েছেন। এ বিশ্বাস তত্ত্বজ্ঞানের রূপ ধরে আসেনি, আনন্দময় শান্ত পরিবেশের মধ্য থেকে আপনিই প্রকাশিত হয়েছে।

চারিদিকে
দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল।

—সুখ

কখনও আবার ক্ষুব্ধ অন্তরের অশান্তিকে বাইরের অজস্র শোভার মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে শান্তির আনন্দ আছে কবি উৎসুক চিত্তে তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। আভাসে-ইঙ্গিতে সেই শান্তির সন্ধান পেয়ে তার মধ্যে কবি অশান্ত হৃদয়ের পরিতৃপ্তি খুঁজেছেন।

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি— কানে আসিতেছে বারে বারে,
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নপুর—
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ। কোথায় গাহিছ গান।
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত।...
খোলো দ্বার খোলো দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্যসভায়।

—জ্যোৎস্না রাত্রে

প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের নিবিড় সাহচর্য চিত্রা কাব্যকে গভীরতায় ভরে দিয়েছে। নানা ভঙ্গিতে নানা রূপে কবি শুধু তার সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করে চলেছেন। তাঁর লীলাসঙ্গিনীকে উচ্ছল রাত্রির আবেশে কখনও শুধু নিতান্ত আপনার করেই উপভোগ করেছেন।

আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি,
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
নবীন মিলনসুখে।

—রাত্রে ও প্রভাতে

আবার প্রভাতের শুভ্র আলোকে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভ্রমপূর্ণ হৃদয়াবেগের মধ্যে তাকে নূতন করে পেয়েছেন। লীলাসঙ্গিনী কবির একান্ত করে পাওয়া

প্রেয়সীর রূপ ত্যাগ করে বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্য থেকে সুদূর বিস্ময়ের মতো কবিকে আকর্ষণ করেছে।

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।...
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা।

—রাত্রে ও প্রভাতে

২

সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দের আপাত পরিপূর্ণতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই একটা অপূর্ণতার বেদনা উপলব্ধি করেছেন। এই বেদনাবোধের দ্বারাই তাঁর একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। নিখুঁৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে একটু বেদনা বা অতৃপ্তি না থাকলে তার আনন্দ প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তাই স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় দেখি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আনন্দের কল্পনাস্বর্গ থেকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ভরা পৃথিবীকেই তিনি ভালোবেসেছেন বেশি করে।

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখেদুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

—স্বর্গ হইতে বিদায়

উর্বশী কবিতায় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক যে নারীমূর্তি কল্পনা করেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির লাবণ্যে গড়া, বিশ্ববাসনার প্রেয়সী সেই নারীমূর্তিও নির্বিশেষ

প্রেম বা সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর পরিপূর্ণতার মধ্যে কোথায় একটু বেদনা রয়ে গেছে।

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দউচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।

—উর্বশী

'দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি'র মধ্যেও এই 'ব্যাকুল-করা বাঁশি' চিরকালই রবীন্দ্রনাথের কোনো সৌন্দর্যউপলব্ধিকে পরিণতির স্থায়িত্বে বেঁধে রাখতে দেয়নি। প্রকৃতির আনন্দ উপলব্ধির মধ্যেও এই অপূর্ণতার বেদনা তাঁকে নূতন অনুভূতির পথে পরিচালিত করেছে বার বার। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের ক্ষণেও এই অতৃপ্তির অনুভূতিই প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের মধ্যে কবিকে অনাস্বাদিত রহস্যের সন্ধান দিয়েছে।

চিত্রা প্রধানত পদ্মার উপরে লেখা। বহু প্রভাত ও সন্ধ্যার বর্ণনাতে এই কাব্যটিতে চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা প্রতিফলিত। তবে এই চিত্রগুলি শুধু চিত্রই নয়, সংগীতের সুরও মিশেছে এর সঙ্গে। চিত্র ও সংগীতের সমন্বয়ে চিত্রার প্রকৃতিবর্ণনা মধুর। আমরা একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করছি।

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
কুটির-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

—সন্ধ্যা

চৈতালি

ভিতরের সঙ্গে বাইরের, অন্তরের নির্লিপ্ত একাকীত্বের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের মিলনজাত আনন্দ চৈতালিতেও রূপ পেয়েছে। সে আনন্দের গান চৈতালির প্রথম কবিতাতেই আছে।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি পড়িবে ভূতল।
—উৎসর্গ

চিত্রার কোনো কোনো কবিতায় যদিও বা দার্শনিকতার একটু আমেজ থাকে, চৈতালিতে কবি তাও কাটিয়ে উঠেছেন, নির্ভয় বিশ্বাসে কেবলই প্রকৃতির আনন্দ আস্বাদন করে চলেছেন, এতটুকু দার্শনিকতাও তাঁর উপভোগের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেনি।

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী 'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি।
—মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্নের অলস উদাস সুর এবং চিত্র রচনার প্রতিভা এখানে সার্থকভাবে মিলিত হয়েছে। শান্ত সৌন্দর্য চৈতালির প্রকৃতিবর্ণনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ু ভরে।
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্তশিয়রে
বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়।
দুই কূলে শুব্ধ ক্ষেত্র শ্যাম শস্যে ভরা,
আলস্যমন্থর যেন পূর্ণগর্ভা ধরা।

—নদীযাত্রা

এইরূপ শান্তদৃশ্যের আনন্দে কবি কেবল ভেসে চলেছেন, 'সুখ অতি সহজ সরল' ইত্যাদির মতো কোনো বিশ্বাসের তীরে ভিড়বার আগ্রহ তাঁর নেই।

যার খুসি রুদ্ধ চোখে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

—তত্ত্বজ্ঞানহীন

তত্ত্বজ্ঞানের চিন্তা না থাকায় তাঁর চিত্ত প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে নিবিষ্ট হবার অবসর পেয়েছে প্রচুর। প্রকৃতির তুচ্ছতম বস্তু, পৃথিবীর লেশতম স্থান, জগতের ব্যর্থতম প্রাণও কবির চোখে অপূর্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। উৎসুক নয়নে কবি নিখিল সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, রূপমুগ্ধ হৃদয় সৌন্দর্যের উপলব্ধি সঞ্চয় করেছে নির্ভাবনায়।

আমরা দেখেছি কবি নারীকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নূতন আনন্দ লাভ করেছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গে বিলীন এই প্রিয়া যে দেবতা হয়ে উঠবে তার আভাসও চৈতালিতে আছে।

মানসরূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য সাথে যাও মিলে মিশে।

চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

—নারী

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নারীর মিলন শুধু আত্মবিলোপ নয়। তার প্রেমের রঙ দিয়ে নারীও প্রকৃতিকে রাঙিয়ে দিয়েছে। তাই প্রকৃতি কবির চোখে সুন্দরতর হয়েছে।

স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।

—প্রিয়া

কল্পনা

চৈতালির কতগুলি কবিতায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ এবং প্রাচীন কাব্য বিশেষ করে কালিদাসের কাব্যের প্রশস্তি আছে। কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য তখনও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রেরণা ছিল, কাব্যবস্তু হয়ে ওঠেনি। রোমানটিক মনের যে বিশেষত্ব কবি কীটস-এর নিকট গ্রীস রোমের প্রাচীন সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল, তারই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও কল্পনা কাব্যে কালিদাসের যুগটিকে সজীব রূপ দিয়েছেন। সে-যুগ থেকে বহুদূরে নির্বাসিত কবি কালিদাসের কাব্যের মধ্যে কবি-কল্পনার অলকার সন্ধান পেয়েছেন। প্রাচীন কাব্যের সংস্কৃতিটি যেন কবির নিজস্ব সৃষ্টির মতো হয়ে উঠেছে।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,

কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

—বর্ষামঙ্গল

এখানে কালিদাসের কাব্যের পরিবেশ শুধু আভাসেই দেখা দেয়নি স্থানে স্থানে তার আক্ষরিক অনুসরণও করা হয়েছে।

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ।

—মেঘদূত, উত্তরমেঘ ১৮

কল্পনা কাব্য রচনার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। ...আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে ; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্ত্যলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি। ...আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরি-শৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি— মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না ; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করেনা। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর !

—প্রাচীনসাহিত্য, মেঘদূত

কল্পনা কাব্যে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে কবিকল্পনার মেঘদূত সেই অদেখা রাজ্যের সন্ধান নিয়ে এসেছে। আমাদের নির্বাসিত হৃদয়কেও কবি সে-যুগের মধ্যে বিচরণ করিয়ে এনেছেন স্বচ্ছন্দগতিতে। কবির স্বপ্নলোকের প্রেয়সীরও সন্ধান মিলেছে কালিদাসের উজ্জয়িনীতে।

দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

—স্বপ্ন

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের মদনভস্মের কাহিনীকেও কবি অপূর্ব অর্থ দান করেছেন মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে নামক দুটি কবিতায়। অস্পষ্ট উপলব্ধির যে ব্যাকুল বেদনা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের মূলকথা, কালিদাসের কাব্যের কাহিনীকে অবলম্বন করে তা ব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।...

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা।

—মদনভস্মের পর

প্রকাশ কবিতাতেও এই অস্পষ্ট উপলব্ধির অতৃপ্তি এবং ব্যাকুলতাটি কবি সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন।[১]

প্রকৃতিবর্ণনায় রুদ্র এবং গম্ভীর রূপের পরিণত পরিচয়ের প্রথম কাব্য কল্পনা। বর্ণনায় চিত্র এবং সংগীতের সমন্বয়ও লক্ষণীয় বিশেষত্ব।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে
শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে ;
দিগ্‌বধূ-চিত-হরষা
ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরষা।

—বর্ষামঙ্গল

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘ ধারা।...

ধূসর-পাংশুল মাঠে, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীতীরে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।

১ দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১০-১২।

২ এই উদ্ধৃতির শেষাংশে সঞ্চয়িতার ধৃত পাঠের অনুসরণ করা হয়েছে। কল্পনার পাঠে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তাতে কবিতাটির সংগীত এবং চিত্রের সমন্বয় অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

—বর্ষশেষ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি পিনাক করাল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

—বৈশাখ

প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। কবি প্রকৃতির এ রূপ বেশিক্ষণ সহ্য করেননি। বর্ষামঙ্গলের প্রথম স্তবকে বর্ষার যে ভৈরবমূর্তি কল্পিত হয়েছিল, দ্বিতীয় স্তবকেই তরল শব্দঝঙ্কারে মন থেকে তার চিহ্ন মুছে যায়।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিত-নয়না,
মালতী মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা

—বর্ষামঙ্গল

ঈশানের ঘন পুঞ্জমেঘের দীর্ঘছায়াকেও কবি 'ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে' কোমল করে দিয়েছেন, বৈশাখকে অনুরোধ করেছেন শান্তিবারিপাতে হোমাগ্নি-শিখা নির্বাপিত করে দিতে।

চিত্রাতে একটি কবিতায় কবি অনাগতদিনের অন্য এক কবির উদ্দেশ্যে আপনার বসন্তের আনন্দের অনুভূতিকে প্রেরণ করেছিলেন।

আমার বসন্ত-গান,
তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে।
—১৪০০ শাল

কল্পনা কাব্যে আপনার উপলব্ধির মধ্যে কবি অতীত যুগের শত শত কবিদের স্পর্শ পেয়েছেন। কালিদাসের কাব্য থেকে প্রকৃতিদৃশ্যের সঞ্চয় আহরণ করলেও কত শত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের উপলব্ধির রূপহীন সঞ্চয় তার প্রকৃতি চিত্রগুলিকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীতমুখরিত বনবীথিকা।
—বর্ষামঙ্গল

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে,
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
—রাত্রি

ধ্যানমৌন রাত্রির সভায় দাঁড়িয়ে কবি ঋষিকণ্ঠের স্তব্ধ ধ্বনি শুনেছেন, তাঁদের উপলব্ধির সম্পদ্ কবির একটি নিদ্রাহীন রাত্রির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

জগতের সেই সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গিহীন তব সভাসদ্,
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ্।
—রাত্রি

নিজের উপলব্ধ প্রকৃতিকে কবি অতীতের উপলব্ধির স্পর্শে চিরন্তন রূপ দান করেছেন।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি।
যে-মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার,
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।

—বসন্ত

ঋতুবর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যযাত্রার পথে পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কিন্তু কল্পনা কাব্যেই বোধহয় সর্বপ্রথম ঋতুগুলিকে পুরুষ বা নারীরূপে আঁকবার সচেতন এবং সফল প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাবে। বর্ষাকে নবযৌবনা নারীরূপে, বসন্তকে পীতাম্বরপরিহিত যৌবনের রূপে এবং বৈশাখকে পিঙ্গলজটাধারী রুদ্রসন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করে কবি তাদের নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। রুদ্ররূপী ভৈরবই এবর্ণনাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। পরবর্তী কালে বনবাণী কাব্যে তিনি একটি বিশেষ ঋতুর ভূমিকা ছেড়ে কবির অন্তরের এবং বাইবের সমস্ত প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ক্ষণিকা

কল্পনা কাব্যে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যগুলির প্রতি কবির অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে আর নৈবেদ্য কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে ভারতের চিন্তা ও দর্শনের প্রতি কবির শ্রদ্ধা। এই দুইটি কাব্যের মধ্যে ক্ষণিকা ক্ষণেকের প্রক্ষেপ। কল্পনার কিছু কিছু চিহ্ন ক্ষণিকার অঙ্গে জড়িয়ে আছে। নববর্ষা সেকাল এবং জন্মান্তর তার প্রমাণ। নববর্ষায় বর্ষার যে রূপ কল্পিত হয়েছে তার পটভূমিতে কালিদাসের ও বৈষ্ণব কবিগণের প্রকৃতিচিত্র ভিড় করে এসেছে, তাদের চিরন্তন আবেদনও কল্পনা কাব্যের কথাই বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওগো নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।

—নববর্ষা

সেকাল কবিতায় কবির কল্পনা কালিদাসের যুগে অভিসারে বেরিয়েছে, আর জন্মান্তর কবিতার পটভূমি হল বৈষ্ণবকাব্যের লীলা-বৃন্দাবন।

বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গনিত বসে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে খসে।

—সেকাল

কালিদাসের কাব্যের চিত্রসাদৃশ্য এখানে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদে পরিণত হয়েছে।

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদগাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্‌
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী॥

—মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২৫

জন্মান্তর কবিতায় বৈষ্ণবকাব্যের তমাল কালিন্দী শাওনমেঘে ময়ূরীর নৃত্য প্রাচীন পটভূমি রচনা করেছে।

ওরে শাঙনমেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমালমূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরি কূলে
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর পরে
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
—জন্মান্তর

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা প্রকৃতির চিরন্তন রূপটি ধরে রাখার চেষ্টা ক্ষণিকা কাব্যের যুগের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা নয়। ক্ষণিকা শুধু বর্তমানের বাতায়ন থেকে দেখা চঞ্চল দৃশ্যের ক্ষণিক উপলব্ধি ; কোনো দৃশ্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকার কাব্য ক্ষণিকা নয়।

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
—উদ্‌বোধন

পলকের ফুটা আর টুটা অনুভূতির গুচ্ছগুলি ক্ষণিকা কাব্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। ক্ষণিকের অনুভূতিকে চিরন্তন উপলব্ধিতে অমরতা দেবার

প্রত্যক্ষ চেষ্টা নেই। এ হিসাবে ক্ষণিকা রবীন্দ্রকাব্যে একটি অভিনব সুর বাজিয়ে তুলেছে। চোখের সামনের দৃশ্যগুলির প্রতি প্রশান্ত নির্লিপ্ততা এ কাব্যটির আকর্ষণ। এই নির্লিপ্ততার জন্য শরতের খণ্ড ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলি এ-কাব্যের একটি বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ শরতের দৃশ্যসম্ভারের মধ্যে যে উদাসীনতা আছে তা কবির এ-কালের অনুভূতির অনুকূল ছিল। শুধু শরৎ নয়, বর্ষা বসন্ত ইত্যাদির বর্ণনাও এ-কাব্যে উচ্ছল বর্ণবৈচিত্র্য পায়নি।

ক্ষণিকার অনেক কবিতা শিলাইদহে লেখা। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির প্রাকৃতিক দৃশ্যপট এখানে পরিবর্তিত হয়েছে। পদ্মার বুকের উপর যে ঘর বেঁধেছিলেন তা ছেড়ে কবি এখন তীরে এসেছেন। তাঁর কবিধর্মের প্রতীক এই নদীর সঙ্গে ভেসে চলায় পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে অনুভূতির যে আবেগ ছিল, এখানে তীরে বসে দূরের চঞ্চল নদীর দিকে তাকিয়ে সে আবেগর রূপও পরবর্তিত হয়েছে। নিজে স্থির হয়ে থেকে চঞ্চল প্রকৃতি ও মানবজীবনের দিকে ক্ষণে ক্ষণে তাকিয়ে শুধু খণ্ড খণ্ড দৃশ্যসম্পদ্ আহরণের চেষ্টা করেছেন। এ আহরণের মধ্যে কবির অনুভূতি শুধু অকারণ আনন্দ পেয়েছে, স্থায়িত্বের মধ্যে এ আনন্দকে বেঁধে রাখতে চায়নি।

গাঁয়ের পথে চলেছিলাম
অকারণে;
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।

—পথে

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইকো স্নানের ঘাট,
ধু ধু করে মাঠ।

ভাঙা বাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে
সকালবেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের 'পরে,
নৌকো চলে দুএকখানি
অলস বায়ু ভরে।
আঘাটাতে বসে রইলে
বেলা যাচ্ছে বয়ে ;—
দাওগো মোরে কয়ে
ভাঙনধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।
—কূলে

কবির নির্লিপ্ত মন শুধু দৃশ্যসম্পদ্ উপভোগ করেছে ভাঙনধরা নদীর কূলে কূলে, সঞ্চয় কিছু নিয়ে যেতে চায়নি। প্রকৃতির মধ্যে গভীর অর্থ সন্ধান এ-কাব্যে নেই। কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনার প্রতিভা পরিবর্তিত হয়নি। চিত্র এবং সংগীতের মাধুর্য নিয়ে তাঁর বহু প্রকৃতিবর্ণনা এ-কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি বর্ষাবর্ণনা উদ্ধৃত করছি।

নীল নব ঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে, ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের খেত জলে ভর-ভর,

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

—আষাঢ়

বর্ষার প্রাকৃতিক উপাদান এবং ধারাপতনের উদাস ও একঘেয়ে ছন্দটি এ কবিতায় এসে ধরা দিয়েছে।

নৈবেদ্য

প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অথচ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে যে অনন্ত সত্তা বর্তমান, কল্পনার কোনো কোনো কবিতায় তার আভাস লেগেছে।—

জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তার মাঝে স্পন্দমান আমি।

—অবিচ্ছিন্ন আমি

নৈবদ্যে কাব্যে এই সুরেরই পরিপূর্ণতা। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে যে নূতনত্বের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি সেটা হল প্রকৃতির স্পর্শ থেকে ভগবানের উপলব্ধিতে উপস্থিতি। প্রকৃতিবর্ণনা নৈবেদ্য কাব্যে নেই তা নয়, বরং অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃতিক রূপের শান্ত পারিপার্শ্বিকতা থেকেই কবি ভগবানের রাজ্যে যাত্রা করেছেন।

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত।

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল,—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

—২৩

'বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে' শুধু ভগবানের স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতেও লক্ষ্য করেছি, এখানে সে আকাঙ্ক্ষা গভীরতর হয়েছে।

ক্রমে ম্লান হয়ে আসে নয়নের জ্যোতি
নয়নতারায়; বিপুলা এ বসুমতী
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন
লয়ে তার সিন্ধু শৈল কান্তার কানন।
বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদুহস্তে লও তুমি টানি।

—২৯

প্রকৃতির স্বতন্ত্র আবেদন এ-কাব্যের মূল প্রেরণা নয়। শুধু পরমপুরুষের উপলব্ধির জন্য তার যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন ততটুকুতেই কবিচিত্তের আকর্ষণ।

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে
কোনো দুঃখ নাহি।

—৪৬

কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তিনি ভাগবত সত্তাকে কোনো দিনই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবে প্রকৃতি আর নারীর সমন্বয়ে গড়া লীলাসঙ্গিনী কিছু দিনের জন্য ভগবানের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন

হয়ে ছিল। স্বতন্ত্র প্রেরণা নিয়ে প্রকৃতি কবিকে এযুগে আর আকর্ষণ করেনি, ভগবানের উপলব্ধিকে সে যতটুকু গভীর করতে পেরেছে ততটুকুই তার সার্থকতা।

খেয়া

নৈবেদ্য থেকে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যুগে কবির সাধারণ পরিণতির মাঝখানে খেয়া কাব্য। এই যুগে স্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ জনমতের সঙ্গে কবিও আপনার কর্মক্ষমতা যুক্ত করেছিলেন। বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে বিশ্বকে ভুলে থাকার সুযোগ নেই। শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তরে এই সময়কার বহু কবিতা লেখা, নূতন পরিবেশের প্রকৃতি তাঁকে যে আহ্বান জানাচ্ছিল তার প্রতিও কবি বিমুখ থাকতে পারেননি। তবে তাঁর এই সময়কার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধিতে একটা বেদনা আছে, সে বেদনা পরিবারের মধ্যে কতগুলি মৃত্যুশোক থেকে উদ্‌ভূত। অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে কিছুকালের জন্য সে শোকের সান্ত্বনা মিলেছিল। গীতাঞ্জলি ইত্যাদি কাব্যের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশের ঠিক পূর্বেই খেয়ার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। কেন তা পরে বলছি।

নৈবেদ্য কাব্যে কবির কাছে প্রকৃতির আবেদন গৌণ হলেও মানব সম্পর্কিত কর্মপ্রচেষ্টায় কবি বিমুখ ছিলেন না। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দৈন্যের ক্ষেত্রে কবি বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পরিপূর্ণতার স্পর্শ কামনা করেছেন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে কবি বিশ্বদেবতার চরণ প্রান্তেই আশ্রয় খুঁজেছেন। খেয়াতে এসে কবি আবার বিশ্বদেবতার আশ্রয় থেকে প্রকৃতির মহলে ফিরে এসেছেন। মানবের সম্পর্কে কবির কর্ম প্রয়াসও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তিনি পথের আহ্বান শুনেছেন কিন্তু সে-পথ বিচিত্র কর্মের পথ নয়, সে পথে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ।

ওগো দিনে কতবার করে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।

কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে,
ওগো দিনে কতবার করে।

—ঘাটের পথ

নৈবেদ্যে বাইরের দৃশ্যসম্পদের মধ্য দিয়ে অনন্ত এক সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন কবি। কিন্তু সে দৃশ্যসম্পদের স্বতন্ত্র আবেদন সেখানে গৌণ। কিন্তু খেয়াতে আবার কবির চোখে প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র মাধুর্যও ধরা পড়েছে।

ওগো কাহারে আজ জানাই আমি,
কী আছে ভাষা—
আকাশ পানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

—বর্ষাপ্রভাত

প্রকৃতিচিত্রের অজস্রতা খেয়া কাব্যের একটি বিশেষত্ব। ক্ষণিকাতে প্রকৃতিচিত্রগুলি প্রধানত পদ্মাকে অবলম্বন করেই আঁকা। খেয়াতে পদ্মাতীরের পটভূমির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নূতন পটভূমির মিলন ঘটেছে। শান্তিনিকেতনের আমলকীগাছ নিমফুলের গন্ধ আর দূরদিগন্তে সারি বাঁধা তালের বন কবিকে মুগ্ধ করেছে।

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলাগাছের কচি পাতায়;
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।...

আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্মরিয়া
সারিবাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন দূরের পারে
চেয়ে আছি আপন মনে।
অলস ধেনু চরে বেড়ায়
সারিবাঁধা তালের বনে।
—বৈশাখে

খেয়া কাব্যে প্রকৃতিচিত্রের স্বতন্ত্র গৌরব আছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তার চেয়েও এর সার্থকতা একদিক্ থেকে অনেক বেশি। নৈবেদ্য কাব্যের বিশ্বকে অন্তরালে রেখে বিশ্বনাথের স্পর্শলাভের প্রয়াস কবিজীবনে সত্য নয় একথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং গীতালির যুগে। এর পূর্বে কাব্যজীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে দ্বৈত অভিনয় চলছিল, ভগবান তার মধ্যে নেপথ্য-আহ্বান পাঠিয়েছেন ; কিন্তু এখন সেই রঙ্গমঞ্চে বিশ্ব-দেবতার সঙ্গে কবির অভিনয়ের পালা আরম্ভ হয়েছে। প্রকৃতি অবশ্য এখানেও একেবারে নেপথ্যচারিণী নয়, রঙ্গমঞ্চে অপ্রধান অংশে বসে সে বিচিত্র সংগীত বাজিয়ে তুলেছে। ভগবান ও কবির দ্বৈত অভিনয়ের মধ্যে সর্বত্রই প্রকৃতির এই সংগীত কখনও মৃদু ও কখনও গভীর স্বরে বেজে চলেছে। গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্যে এই সংগীতময় পরিবেশের ভূমিকা রচনা করেছিল খেয়ার প্রকৃতি উপভোগের নূতনতম আস্বাদ। কবিজীবনে তাই খেয়ার মূল্য রয়েছে প্রচুর। তাছাড়া খেয়াতে গীতিকবিতার ভাব ও রূপের আবেদন সৃষ্টিতে কবির যে দক্ষতা প্রকাশ পেয়ে পরবর্তী কাব্যগুলিকেও তা সরস করে রেখেছে।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি

সোনার তরী চিত্রা চৈতালি প্রভৃতি কাব্যে প্রকৃতির সাহচর্যে কবি প্রেম সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনুভূতি লাভ করেছিলেন সেই প্রেম সৌন্দর্য ও মাধুর্যের রসস্বরূপ দেবতা যিনি, গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং গীতালি তাঁরই সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং পরিতৃপ্তির কাব্য। এই কাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে প্রক্ষিপ্ত বলে যে মত প্রচলিত আছে, গ্রন্থের সূচনায় আমরা তার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছি। প্রেম-সৌন্দর্য-আনন্দের প্রকাশ থেকে প্রেম-সৌন্দর্য- ও আনন্দ-স্বরূপে পৌঁছাবার চেষ্টার মধ্যে অস্বাভাবিকতা এবং আকস্মিকতা নেই। বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যের মূলপ্রেরণা প্রকৃতি এই কাব্যগুলিতে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও অধ্যাত্ম অনুভূতি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে প্রকৃতিপ্রেমের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি। এমন কি অনেকগুলি কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের অনুভূতিই প্রবল, অধ্যাত্ম অনুভূতি তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থেকে মৃদু সৌরভের মতো সমস্ত কবিতাটির উপরে গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেল রে দিন বয়ে
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যে যায় কয়ে।

গীতাঞ্জলি, ১৯

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।

আকাশে ঐ অরুণরাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার
মায়ার খেলাতে।

—গীতিমাল্য, ২৭

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলংকার।
ঐ যে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল
পূজায় তাঁহার ভরিল অন্ধকার।

—গীতালি, ৬১

এরকম নিসর্গানুভূতির কবিতা গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে নিতান্ত অল্প নয়। যে কবিতাগুলিতে অধ্যাত্ম অনুভূতির পরিচয় প্রধান সেগুলিও প্রকৃতির স্পর্শলেশহীন নয়। প্রকৃতপক্ষে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে বর্ষা শরৎ বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন করে ফুটেছে তেমন করে ফুটেছে খুব কম কাব্যেই। প্রভাত এবং সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণনাও এই কাব্যগুলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কবির অধ্যাত্মজীবনের যে সার্থকতার পরিচয় এই কাব্যগুলি বহন করছে তাও কেবল বিশ্বদেবতাকে অবলম্বন করেই নয়। ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যও তার মধ্যে জড়িয়ে আছে।

এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে
তব আনন্দ মহাসংগীতে বাজে।…
ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তরে মোর নিত্যনূতন সাজে।

—গীতাঞ্জলি, ১০১

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি,
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন

আকাশ পানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী ।...
যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভরতে পারি ডালা ।
—গীতিমাল্য, ৪০

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি তিনটিই কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ, সুতরাং এদের প্রকারগত প্রভেদ নেই। কিন্তু পরিমাণগত প্রভেদ এদের মধ্যেও আছে। গীতাঞ্জলি অভিসারের কাব্য, গীতিমাল্য মিলনের, আর গীতালি ভাবসম্মিলনের। বিশ্বদেবতাকে হৃদয়ে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জলিতে পূর্ণ হয়নি, ক্ষণে ক্ষণে শুধু তাঁর দর্শন মিলেছে। গীতিমাল্যে আকাঙ্ক্ষিত মিলন এসেছে, আর গীতালি প্রৌঢ় মিলনের গুঞ্জনে পূর্ণ। যদিও তিনটি কাব্যেই বর্ষা শরৎ বসন্তের বর্ণনা স্থান পেয়েছে তবুও এই প্রভেদটির জন্যে গীতাঞ্জলিতে বর্ষা, গীতিমাল্য বসন্ত, আর গীতালিতে শরৎ ঋতুর প্রাধান্য; বর্ষা অভিসারের ঋতু, বসন্ত মিলনের, আর ভাবসম্মিলনের মধ্যে উচ্ছ্বাসহীন যে উপলব্ধি থাকে তার পক্ষে শরতের পরিবেশই সবচেয়ে উপযোগী। গীতাঞ্জলির প্রথম দিকে কতগুলি শরতের গান আছে। সেগুলি শারদোৎসব থেকে সংগৃহীত। কতকগুলি উদ্ধৃতির সাহায্যে এ উক্তিটি সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করব।

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে,
নিশার মতো নীরবে ওহে
সবার চিঠি এড়ায়ে এলে।
—গীতাঞ্জলি, ১৮

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেলরে দিন বয়ে।

বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।
—গীতাঞ্জলি, ১৯

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
—গীতাঞ্জলি, ২০

এস হে এস, সজল ঘন,
বাদল বরিষণে ;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।
—গীতাঞ্জলি, ৩৫

চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।
—গীতাঞ্জলি, ৭০

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, কর
করুণ আঁখিপাত।
নিবিড় বনশাখার 'পরে
আষাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদলভরা আলসভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
—গীতাঞ্জলি, ৮৬

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা
বুকের 'পরে দোলে রে তার
পরাণ-পুতলা।
—গীতিমাল্য, ৫৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে।
—গীতিমাল্য, ৬৫

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ওই যে মেতে ওঠে নদী।
—গীতিমাল্য, ৮৫

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
—গীতিমাল্য, ৮৬

যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে?
—গীতিমাল্য, ৮৯

এই যে শরৎআলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
—গীতালি, ১৫

শরৎআলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলো চুলে
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?
—গীতালি, ১৬

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
—গীতালি, ২৬

কাঁচা ধানের খেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো,
তেমনি করে আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো।
—গীতালি, ৪২

নূতন প্রাকৃতিক পটভূমি খেয়ার কবিতাগুলিতে রূপ পেতে আরম্ভ করেছিল, সে-কথা বলেছি। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালিতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর আর দিগন্তের সীমানায় তালগাছে আঁকা উদার আকাশের মধ্যে যে বৈরাগ্য এবং প্রশান্তি আছে তা এই তিনটি কাব্যের অনুভূতির মধ্যে মৃদু সৌরভ বিস্তার করেছে। বর্ণনার মধ্যেও এই পটভূমির চিত্র মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেনি তা নয়। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ঋতুর সমারোহ যে নূতন স্পর্শ রেখে যায় তা তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলিতে; বিশেষ করে ঋতুনাট্য এবং গানে, প্রকাশ পেয়েছে।

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন কোনো একটি বিশেষ অনুভূতির গণ্ডির মধ্যে চিরন্তন বন্ধন স্বীকার করেনি। যে ভাগবত অনুভূতি গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে কবির আশ্রয় হয়েছিল, তার মধ্যেও তাঁর কবিত্বের প্রকাশ আবদ্ধ রইল না। অনুভূতির আপাত-পরিপূর্ণতার মধ্যেও যে অপূর্ণতার চাঞ্চল্য চিরকাল তাঁর কাছে নূতন অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, গীতালির কয়েকটি কবিতায় তার আভাস আছে।

পথের সাথি, নমি বারংবার।
পথিকজনের লহ নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহ নমস্কার।…

জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার॥
—গীতালি, ৭৮

বলাকা

গীতালির পর এই 'নিত্য পথের পথী' আবার নূতন কাব্যানুভূতির পথে যাত্রা করলেন। ভাবপ্রকাশের দৃপ্ত ভঙ্গিতে স্বাধীন ছন্দের বলিষ্ঠ গতিতে চিরযৌবনের জয়গানে বলাকা রবীন্দ্রকাব্যজীবনে নূতনের সুর বহন করে নিয়ে এল, কবির অনুভূতির সামনে দেখা দিল আরএকটি দিগন্ত।

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।
—৩৬

ভগবদ্‌ভক্তির বেদীতে আপনার সমস্ত অনুভূতির শেষ নিবেদনের মধ্যে যে বৈরাগ্য আছে, তার প্রতিক্রিয়া বলাকা কাব্যের সুরে একটি গতিবেগ

সঞ্চার করেছে। এই গতিবেগের মধ্যে কবি নিখিল বিশ্বকে উপস্থাপিত করে তাকে নূতন পরিচয়ে রহস্যমণ্ডিত করে দেখেছেন। গতিবেগ রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতির স্বধর্ম, কিন্তু গতিকে এত নিবিড় ভাবে কাব্যের বিষয়বস্তু করে তোলা হয়নি অন্য কোনো কাব্যে। গতিশীল কালের প্রবাহকে কবি এক বিরাট অদৃশ্য নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, গতিপ্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে বস্তুবিশ্বের ফেনপুঞ্জ জেগে উঠছে। কালপ্রবাহের গতিবেগ আবিষ্কারের প্রথম উত্তেজনায় কবি মাঝে মাঝে স্থিতিকে অস্বীকার করেছেন। বিশ্বের সৌন্দর্যের ডালা তার কাছে পরিণামহীন এক বিরাট্ স্রোতের মুখে বুদ্‌বুদের মতো মনে হয়েছে।

হে বিরাট্ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি,
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে।…
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী।…
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

কিন্তু এই নিরুদ্দেশ চলা, কালরূপী প্রবাহের পরিণামহীন মত্ত বেগ কবির চিরজীবনের বিশ্বাস নয়। গতিকে কবি অস্বীকার করেননি। সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যেও গতিবেগ আছে, সেই গতিবেগের চঞ্চলতা সৌন্দর্যকে এক পরিণাম থেকে বৃহত্তর পরিণামের দিকে চালিত করছে, কিন্তু এই গতি উদ্দেশ্য বা অর্থহীন নয়। যাত্রার পথে পথে সে তার সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে, অলব্ধ পরিপূর্ণতার দিকে তার এই যাত্রা। বিশ্বজোড়া এই গতিবেগকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই বলাকায় কবি যৌবনের জয়গান করেছেন বিশেষভাবে। ভাগবত অনুভূতির প্রৌঢ়তার মধ্যে যে নিস্পৃহ শান্তি আছে

বলাকায় চিরযৌবনের জয়গানের মধ্যে সে শান্তিকে কবি পেছনে ফেলে এসেছেন।

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আজি বসন্তের মাতাল বাতাস ;···
বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।
—১৩

যৌবনকে কবি রুদ্রের প্রসাদ আখ্যা দিয়েছেন। বলাকার বহু কবিতায় এই যৌবনের জয়গান। জীবনের এ পর্বে যৌবনচেতনার প্রতি এই নূতন দৃষ্টি হয়তো কবির য়ুরোপ ভ্রমণের ফল। য়ুরোপে যৌবনের মত্ততার যে তাণ্ডবনৃত্য অশান্তি জাগিয়ে তোলে তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেননি কোনোদিন, কিন্তু যৌবনের মধ্যে যে সজীব প্রাণশক্তি আছে কবির সন্ধানী দৃষ্টি তা আবিষ্কার করতে পেরেছিল। প্রকৃতিকেও কবি এই নবলব্ধ যৌবনচেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। কিন্তু পরিণামহীন গতিবেগকে যেমন কবি পরিণামের সফলতায় টেনে এনেছেন, যৌবনের উচ্ছ্বাসের অপচয়কেও তেমনি ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণতায় স্নিগ্ধ করে দেখেছেন।

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।
একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
—২৩

বলাকার প্রায় সব কবিতাতেই একটা দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা আছে। তবু কবিত্বের সৌরভে তার তত্ত্ব অংশ প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। নিছক প্রকৃতি অনুভূতির কবিতা বলাকায় খুব বেশি নেই। কিন্তু তাঁর দার্শনিক তত্ত্বটিকে কাব্যরূপ দেবার জন্য যে প্রাকৃতিক আবহাওয়া প্রয়োজন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। সে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্য থেকে তাঁর আলোচ্য তত্ত্বটি আপনিই কবিতার আকার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নিখিল বিশ্বের মধ্যে গতিময় আবেগের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ঝিলমের তীরে একটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়। সে সন্ধ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূক চেতনাটিকে তিনি তার এই নবলব্ধ বিশ্বাসের উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরির কাজে মুখর করে তুলেছেন।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

—৩৬

পূরবী, মহুয়া

বিশ্বজগতের গতিবেগ এবং যৌবনের জয়গানে কবির সুদূরবিহারী ভাবনার পাখায় যে কালরূপী বিরাট্ আকাশের স্পর্শ লাগছিল তার থেকে মুক্ত হয়ে কবি আবার ধরণীর মাটিতে নেমে এলেন পূরবী কাব্যে। প্রকৃতি আর নারীর সমন্বয়ে গড়া লীলাসঙ্গিনী আবার তাঁকে আহ্বান জানাল।

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজ ফেলে চলে গেলে কোন্ দূরে
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে,
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

—পূরবী, লীলাসঙ্গিনী

এই লীলাসঙ্গিনী জীবনের পর্বে পর্বে তাঁকে নূতন করে বহুবার আহ্বান করেছেন। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যুগে ভাগবত অনুভূতির প্রবলতায় তার স্পর্শ কবির কাছে উন্মাদনা হারিয়েছিল, তবুও যে মাঝে তার দেখা তিনি পাননি তা নয়।

এই শরৎআলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।
আকুল কেশের পরিমলে
শিউলিবনের উদাস বায়ু
পড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয় মাঝে হৃদয় দুলায়
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে॥

—গীতালি,১৫

এই রূপটি লীলাসঙ্গিনীরই ; যদি বিশ্বদেবতার কোনো আভাস থেকে থাকে তবে তিনি লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গেই মিশে আছেন। কিন্তু দুএকটি ক্ষণিক দর্শনের স্মৃতি ছাড়া লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে আর কোনো ঘনিষ্ট মিলনের আনন্দ গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যুগ থেকে কবি সঞ্চয় করতে পারেননি। আজ যখন আবার তার দিকে নজর পড়ল, কবি তখন দেখতে পেলেন এ পৃথিবী থেকে বিদায়ের দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। জীবনসন্ধ্যার পূরবীসংগীতে লীলাসঙ্গিনীর আবাহনে তাই একটি বেদনা গভীর হয়ে বাজছে।

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়
সারা হয়ে এল দিন,
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।

—পূরবী, লীলাসঙ্গিনী

এই পার্থিব জীবন এবং মৃত্যুকে জড়িয়ে যে অনন্ত মহাজীবনের লীলা চলছে, কবি পূরবীর পূর্ব যুগেই আপনার বিশ্বাসের মধ্যে তাকে নিবিড় করে পেয়েছেন। কিন্তু এ পৃথিবীর জীবন তাঁর শেষ হয়ে আসছে, এর স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের মহলে কবির অধিকার আসছে লুপ্ত হয়ে। তাই শেষ কটা দিন কবি এই পৃথিবীর প্রকৃতিকে উপভোগ করে নিতে চান।

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।

—পূরবী, ক্ষণিকা

পরবর্তী মহুয়া কাব্যও জীবনের শেষ বসন্ত উপভোগের আকাঙ্ক্ষার অধীর সুরে ভরা। কবির চির-নতুন প্রাণ আবার যৌবনের মতো প্রকৃতির সৌন্দর্য সঞ্চয় করেছেন, নারীও এ উপভোগের মধ্যে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করেছে।

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে॥

—মহুয়া, শুভযোগ।

মহুয়ার তপোভঙ্গ নামক কবিতাটিতে কবি ভাগবত অনুভূতির তপে মগ্ন আপনার মনকে যেন চিরযৌবনের উচ্ছলতার মধ্যে আহ্বান করেছেন।

যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি?…
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।

—পূরবী, তপোভঙ্গ

কালের অধীশ্বর রুদ্রই এখানে কবির কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস, সৃষ্টির সৌন্দর্য তাঁরই মধ্যে বিধৃত। কবির মানস-সুন্দরীর বাইরের বিচিত্র রূপ এবং অন্তরের একাকিত্বের মহিমা এই কালের অধীশ্বর রুদ্রের মতোই। বনবাণী কাব্যের একাংশ জুড়ে আছে নটরাজ নামে একটি পালাগান। তার ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট্ নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন সব বন্ধনমুক্ত হয়।'[১] এখানেও লীলাসঙ্গিনীর দ্বৈতরূপের মতো নটরাজ অন্তর ও বাহির অধিকার করে আছেন। তবে প্রভেদ এই যে লীলা-সঙ্গিনীর সঙ্গে কবির ভাববিনিময়ের মধ্যে যে লীলাচাঞ্চল্য আছে, নটরাজের সঙ্গে কবিশিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে অতি সাধারণ কারণেই সেটা প্রাধান্য পায়নি, যৌবনের উচ্ছল আবেগের চেয়ে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্যই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। লীলাসঙ্গিনীর মতো এই নটরাজও রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অপূর্ব সঞ্চয়।

১ নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার ভূমিকা; রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকেই কবি এঁর মূর্তি কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু কবিজীবনের বিশেষ প্রেরণা এবং বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে এঁকে নূতন ভাবে যুক্ত করে নটরাজের মূর্তির প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেও একটি স্বকীয়তার ছাপ রেখে গিয়েছেন।

বনবাণী

মহুয়ার পরবর্তী বনবাণী কাব্য অরণ্যের মূক বৃক্ষজীবনের প্রশস্তি-গান। গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব-জগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়, তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।'[১]

জীবজগতের আদিভাষার সঙ্গে কবিহৃদয়ের এই সাক্ষাৎ সম্পর্কের রঙে বনবাণীর সবগুলো কবিতা অনুরঞ্জিত। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যুগের পর নূতন করে যখন কবি আবার প্রকৃতির স্বকীয় রহস্যের মহলে আহ্বান পেলেন তখন তার গানের ডালা ঋতু সংগীতে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এই ঋতুসংগীতগুলির মধ্যে কয়েকটি বনবাণী কাব্যের নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা অংশে সংকলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী তাঁকে ঋতু-সংগীত রচনার উপযুক্ত প্রেরণা যুগিয়েছিল। 'আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি, তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তরপ্রত্যুত্তর কিছু কাল থেকে আমার চলছে।'[২]

এই উত্তরপ্রত্যুত্তরের পালা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল, প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে নববর্ষ বর্ষামঙ্গল শারদোৎসব বসন্তউৎসব এই উত্তরপ্রত্যুত্তরের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠত। ভারতবর্ষের মতো ঋতুপূজারী কবিদের দেশেও

১ বনবাণী, ভূমিকা।

২ পাঠপরিচয়; মহুয়া, প্রথম সংস্করণ।

একমাত্র কালিদাস ছাড়া এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কবি বোধ হয় নেই।

পূরবী মহুয়া এবং বনবাণীতে কবিদৃষ্টির একটি নূতনত্বের আভাস' আছে। উপেক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানকে কবি সম্মানের আসনে এনে বসিয়েছেন। পূরবীতে অবজ্ঞাত আকন্দফুলের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়েছে।

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা.
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ।
—পূরবী, আকন্দ

শুধু আকন্দ নয়, বহু নাম-না-জানা গোত্রের গরিমাহীন ফুলের কথাও তিনি এই কাব্যে স্মরণ করেছেন। বনবাণীতে কুরচি ফুলের প্রশস্তি আছে।

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি, তারে কবি করেছে ভৎর্সনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে।
—বনবাণী, কুরচি

উপেক্ষিত ফুলগুলির প্রতি এই দরদ পরবর্তী পরিশেষের যুগ থেকে নূতন সম্ভাবনায় রূপ নিয়েছে।

পরিশেষ

রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর উন্মেষপ্রবণতা আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি। বিকাশের কোনো পর্যায়ের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা চিরন্তন স্থিতি লাভ করেনি এক যুগের পরিণতি অন্য যুগের সূচনায় তিনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। এই পরিণতির প্রত্যেকটি পর্বই রবীন্দ্রকাব্যরসিকের নিকট বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু বনবাণীর পর পরিশেষ কাব্যে পরিপূর্ণ বার্ধক্যের মধ্যে কবিপ্রতিভার যে পরিণতির সূচনা দেখা গেল তার তুলনা সমগ্র রবীন্দ্রজীবনেও দুর্লভ। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যুগের ভাগবত অনুভূতির প্রাধান্য থেকে মহুয়া বনবাণীর যুগে তিনি আবার প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের মহলে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বনবাণীর পর তাঁর পরিণতি আরও ব্যাপক এবং গভীর। এই পরিণতির পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে তার আলোচনা করলে প্রকৃতি-প্রেমের ক্ষেত্রেও তার পরিণতির রূপটি বোঝা সহজ হবে।

অত্যাচারিত এবং নিপীড়িতের জন্য বেদনাবোধ রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। পূর্ববর্তী বহু কাব্যে এবং গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির পরিচয় বিশেষভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আশাবাদী, তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল এই অত্যাচার নিপীড়ন একদিন শেষ হবেই, ক্ষমতাবানের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে অত্যাচারিত সাধারণের দুঃখবেদনার অবসান করে দেবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের ফলে য়ুরোপ যে সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, য়ুরোপের প্রত্যেক সাহিত্যে তার চরম রূপটি সঞ্চারিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের মধ্যস্থতায় য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আমরাও সেই স্বপ্নের আভাস পেয়েছিলাম। এই পরিবেশের মধ্যে জন্ম বলেই রবীন্দ্রনাথও ক্রমপরিণতির পথে অত্যাচার এবং অকল্যাণের অবসান হবে বলে বিশ্বাস করতেন। তার জন্য অত্যাচারিতের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আর প্রয়োজন হবে না এ ধারণাও তাঁর ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে জগৎজোড়া স্বার্থান্বেষী অত্যাচারীর যে নগ্নরূপ প্রকটিত হয়ে পড়ল তাতে রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মনও রূঢ় আঘাত পেয়েছিল। এই অত্যাচার এবং

অবিচারের মাত্রা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকেই মানুষের এতদিনের সঞ্চিত সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে একেবারে ধ্বংস করে দেবার উপক্রম করেছিল। শেষদিন পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মন অবশ্য সুন্দর ভবিষ্যতেরই স্বপ্ন দেখে গিয়েছে, তবুও জগৎজোড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতদের পক্ষ থেকে তিনি প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। যে পরিণতি অতি স্বাভাবিক ভাবেই হবে বলে তিনি পূর্ববর্তী জীবনে আশা করেছিলেন, সেই পরিণতির জন্যেই তিনি উত্তর জীবনে অত্যাচারিতদের দিক থেকে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। পরিশেষ থেকে আরম্ভ করে শেষলেখা পর্যন্ত তাঁর শেষজীবনের কাব্যগুলিতে এই বিদ্রোহের আভাস সূচিত হয়েছে।

ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।

—পরিশেষ, আহ্বান

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

—পরিশেষ, প্রশ্ন

এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শতগুণে শ্রেয়।
ছদ্মবেশ-অপগত
শক্তির সরল তেজে সমুত্থত দাবাগ্নির মতো
প্রচণ্ড নির্ঘোষ,
নির্মল তাহার রোষ,

তার নির্দয়তা
বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা।
—বীথিকা, কলুষিত

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
—পত্রপুট, ১৬

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।
—প্রান্তিক, ১৮

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে বেদনা এবং বিদ্রোহের যে সুর প্রকাশ পেয়েছে অত্যাচারিতদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের পূববর্তী জীবনের কোনো প্রতিবাদই এর চেয়ে উচ্চতর সুরে ধ্বনিত হয়নি। এই অত্যাচার অবিচারের অন্ধকার ভেদ করে নূতন যুগের যে সম্ভাবনার আভাস সূচিত হচ্ছিল তা অত্যাচারিত জনগণের অভ্যুত্থানের আশা। জগতের বহু জায়গায় এই সম্ভাবনাটি স্পষ্টরূপ নিয়েছিল। আজন্ম আশাবাদী রবীন্দ্রনাথও সহজাত প্রেরণায় এই অভ্যুত্থানের মধ্যে স্পষ্ট আশার সংকেত লাভ করেছিলেন, মহামানব রূপ এই গণঅভ্যুত্থানের আগমনী তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

ঐ মহামানব আসে ;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

—শেষলেখা, ৬

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সাধারণ লোকের শক্তির যে দিক্‌টা আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছিল, জনগণের জীবনের সুখদুঃখের প্রতি আমরা ক্রমবর্ধমান যে সচেতনতা লাভ করছিলাম রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে তা স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছিলেন। সেখানকার প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাঁর নূতন প্রেরণাকে উপাদান যুগিয়েছিল। সমাজের নিম্নস্তরের প্রতি এত দরদ, কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের জানবার এতখানি আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। তাদের খুব কাছাকাছি যেতে হলে যে-প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার অভাব সম্বন্ধে কবি সর্বদাই সচেতন।

চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সকল সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।...
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

—জন্মদিনে, ১০

জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় লাভের এরকম গভীর আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনের সুখদুঃখের বিচিত্র সুরটিকে আপনার কাব্যে অনুরণিত করে তোলার এত কঠিন সংকল্প রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে একটি নূতনত্বের সুর বহন করে নিয়ে এসেছে।

২

রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশেষ পরিণতি সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বহু বিচিত্র শক্তির সংমিশ্রণ এবং সংঘাতে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যের যে পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল, তাতে সাধারণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নূতন করে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতিপ্রেমের বিচারেও এই নূতন দৃষ্টির প্রভাব এযুগের কাব্যকে অনুরঞ্জিত করেছে। পূর্ববর্তী জীবনে প্রাকৃতিক যে দৃশ্যসম্পদ থেকে কবি আপনার আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছেন, সৌন্দর্য ছিল তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এযুগে যেমন সাধারণ মানুষের দিকে দৃষ্টি পড়ল, তেমনি প্রকৃতির অত্যন্ত সাধারণ এবং আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মধ্যেও কবি একটি রহস্যের সুষমা আবিষ্কার করলেন। তাই দেখতে পাই কবিত্বের প্রচলিত রীতিতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান সুন্দর বলে বহুদিন থেকে গৃহীত হয়ে আসছে, তাছাড়াও বহু সাধারণ জিনিস নিয়ে তিনি এযুগে কবিতা লিখেছেন। চিরদিনের অবজ্ঞাত বহু ফুলকে তিনি কবিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন; কন্টিকারী, তেঁতুলের ফুল ইত্যাদি তাঁর কাব্যে অমরত্ব লাভ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রবীন্দ্রকাব্যজীবনেও একটি অপূর্ব সজীবতার সৃষ্টি করেছে। পরিশেষ কাব্য থেকেই তার স্পষ্ট সূচনা। পূর্ববর্তী পূরবী মহুয়া বনবাণীর যুগে এর আভাস সম্বন্ধে আমবা পূর্বেই মন্তব্য করেছি।

ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।

—পরিশেষ, আছি

পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি,
অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি,
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
মাটির কাছে নত হলে পরে
স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে।
—পরিশেষ, কণ্টিকারি

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে ;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই।...
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা,
তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুণ্ণ মর্যাদা
শ্যামল সম্পদে
তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পূজার অঞ্জলি।
—পরিশেষ, আঘাত

আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।
পাতার রঙ হলদে-সবুজ,
ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্পকরা পেয়ালা, বেগুনি রঙের।
প্রশ্ন করি, নাম কি,
জবাব নেই কোনোখানে।...
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
দৃষ্টি চলেনা এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
—পত্রপুট, ৮

জীবনে অনেক ধন পাইনি,
নাগালের বাইরে তারা;
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি
হাত পাতিনি বলেই।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখঢাকা,
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে,
এই তেঁতুলের ফুল।
—শ্যামলী, তেঁতুলের ফুল

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে এই নূতন ধারার সংযোগ করেছে বলে প্রকৃতি প্রেমের বিচারে পরিশেষ কাব্যটির বিশেষ মূল্য আছে।

খেয়া কাব্যের সময় থেকে বীরভূমের প্রাকৃতিক পটভূমি রবীন্দ্রনাথের রচনায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, সেকথার আলোচনা আমরা করেছি। তার পরবর্তী গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতেও এই রুক্ষ প্রান্তরময় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূরবী মহুয়া বনবাণীর যুগে কবি আবার প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের মহলে ফিরে এলেন, পরিশেষ থেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন নূতন পরিণতিতে। এখন থেকে বীরভূমের এই পরিবেশ তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করল। পদ্মাতীরের শ্যামল আর নীল পরিবেশের মধ্যে ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু বীরভূমের পরিবেশ উচ্ছলতাহীন দৈন্যের।

কবির এযুগের রচনায় সাধারণের প্রতি যে আকর্ষণ, বীরভূমের গেরুয়া খোয়াই, ধূ ধূ করা বন্ধুর মাঠ, সরসতাহীন দূর দিগন্ত, এ সমস্তই তার অনুকূল আবেষ্টনী রচনা করেছিল।

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে,
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে ;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়।···
রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে।
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিকসীমায়
অস্ফুট ঐ বাষ্প নীলিমায় ;
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে।

—পরিশেষ, আছি

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতালপাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।

—পুনশ্চ, কোপাই

কাব্যের বিষয়বস্তুর গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের গরিমাহীন কোপাই তাঁকে টেনেছে। অনেক উপাদানের ভারে সাজানো, কবিত্বের রাজ্যে আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে যে সকল দৃশ্যসম্পদ্ আমাদের মনকে আসক্ত করে তোলে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত নিরাসক্ত মনের কাছে তার আবেদন ক্ষীণ হয়ে

এসেছে। বিরলসমারোহ দৃশ্যপটের মধ্যে মন যেখানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না, সেখানে কবিমন নিবিষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে।

ফাল্গুনের রঙিন আবেশ
যেমন দিনে দিনে মিলিয়ে দেয় বনভূমি
নীরস বৈশাখের রিক্ততায়,
তেমনি করেই সরিয়ে ফেলেছ হে প্রমদা, তোমার মদির মায়া
অনাদরে অবহেলায়।
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকী,
পাত্র উজাড় করে
জাদুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।
—পত্রপুট, ১১

পূর্ববর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার মূলপ্রেরণা ছিল পদ্মার গতিশীলতা। এখন কোপাইএর তির্যক্ গতিভঙ্গিও তাঁর কাব্যের প্রেরণা যোগাচ্ছে। রুক্ষ গেরুয়া প্রান্তরের মধ্যে যে বৈরাগ্যের সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, তাল আর শাল গাছের বাইরের রুক্ষতার অন্তরালে যে সরস মহিমময় রূপ আছে, সেগুলিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আদর্শ হয়ে উঠেছে। এযুগের ঋতুববর্ণনার মধ্যে উচ্ছল বর্ণবৈচিত্র্য তো নেইই, পরন্তু কল্পনার যুগে ঋতুবর্ণনায় রুদ্ররূপ সংস্থানের যে সূচনা হয়েছিল তাও এখানে ক্রমবর্ধমান সাফল্য লাভ করেছে। তাই বৈশাখের নিরাসক্ত ভৈরবমূর্তিই এযুগে প্রধান হয়ে উঠেছে, কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী লীলাসঙ্গিনী আপনার প্রাধান্য সংকুচিত করেছে ত্যাগের অন্তর্মুখী দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল নটরাজের নিকট। নটরাজকে সমস্ত ঋতুচক্র এবং সমস্ত বিশ্বনিয়মের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে কবি পৌরাণিক সংস্মৃতিগুলির সঙ্গে একটি নূতন ভাব সংযুক্ত করে দিয়েছেন। মহুয়া কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা একথার উল্লেখ করেছি।

বাইরের সমারোহবর্জিত দৃশ্যসম্পদ্ এযুগের আদর্শ বলেই, প্রকৃতি-বর্ণনায় এযুগে কবিমনের চিত্রকরসুলভ নির্লিপ্ততা চরম রূপ পেয়েছে। উপরে

উদ্ধৃত প্রকৃতিচিত্রগুলিতে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাবে। কবির নিরাসক্ত মন পুর্ববর্তী কালের আবেগ বর্জন করেছে, কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা কমেনি। প্রকৃতির সমারোহের মধ্যে কবিচিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি।

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,
দেখার জিনিস এটা।

—নবজাতক, ইস্টেশন

৪

পূরবী মহুয়ার যুগে যখন কবি ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য থেকে আবার লীলা-ময়ী প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে ফিরে এলেন, তখন কবির মনে অতীত স্মৃতিগুলি করুণ বেদনার সুরে বাজতে আরম্ভ করেছিল। আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনা কবির প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে একটি নূতন রাগিণী যোগাল। পরিশেষ কাব্যেও অতীত স্মৃতিপরিক্রমা রয়েছে। এই স্মৃতির বেদনার অংশটুকু কবি কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেননি কিন্তু কবির বিদায়ী দৃষ্টিতেও এই জীবনের এবং জগতের সুষমার মধ্যে যে বিস্ময়ের রহস্য লেগে ছিল, তার প্রভাবে বেদনাবোধ কখনই প্রধান হয়ে ওঠেনি। পুরাতন স্মৃতি আর নূতন করে আবিষ্কারের রহস্য দুইই তাঁকে সমানভাবে টেনেছে।

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।...
এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন।

—পরিশেষ, বিস্ময়

অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা
অরণ্য তাহারি তলে ঊর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ-কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।
—আরোগ্য, ৬

একদিকে নূতন বিস্ময়ের আনন্দ, অন্যদিকে একে অবলম্বন করেই পুরাতন স্মৃতির বেদনা উভয়ের সংমিশ্রণে কবির এযুগের প্রকৃতিপ্রেম মধুর হয়েছে। এযুগের বহু কবিতায় কবি সারা জীবনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার হিসাব করেছেন। জন্মদিনে, পঁচিশে বৈশাখ, তেঁতুলের ফুল ইত্যাদি কবিতায় তার প্রমাণ আছে। এই কবিতাগুলিতেও অতীত জীবনের স্মৃতিসঞ্চয়ন অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতি সাধারণ একটি সূত্রকে অবলম্বন করে কবি অতীত জীবনে মানসভ্রমণ করে এসেছেন।

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা।...
সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে।
তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।
—পরিশেষ, বালক

এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে।
হেনকালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে
পথকোণের ঘন বনের থেকে।
এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের 'পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলাম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, 'তুমি আমার প্রিয়'।
—পরিশেষ, চিরন্তন

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে।
—শেষ সপ্তক, ৪৩

ঘণ্টা বাজে দূরে।
শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার
মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।...
মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দু-পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।

জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
—আরোগ্য, ৪

৫

পরিশেষের যুগ থেকে প্রকৃতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই যুগের প্রত্যেকটি কাব্যের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। পুনশ্চ কাব্যে কবি নূতন ছন্দের সাহায্যে প্রকাশের রীতিতে সহজ ঋজুতা এনেছেন, কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে অতি সাধারণ দৃশ্যগুলি। শেষ সপ্তক কাব্যে প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে অন্তর্মুখী কবিপ্রকৃতির জীবনজিজ্ঞাসা জড়িয়ে আছে। বীথিকা ও পত্রপুটে এই অন্তর্মুখী চিত্তের ধ্যানগভীরতা আরও বেড়েছে, তারই সঙ্গে বেড়েছে অনুভূতির গাঢ়তা আর প্রকাশভঙ্গির গাম্ভীর্য। সেঁজুতি কাব্যে সন্ধ্যাদীপের আলোকে এই মাটির পৃথিবীর প্রকৃতির নিকট কবি তাঁর প্রেরণা-সংগ্রহের গভীর স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সানাই কাব্যে লীলাসঙ্গিনীর সুদূর স্মৃতি ভৈরবী গান বাজিয়েছে। রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর মৃত্যুর কবল থেকে সদ্যোমুক্ত প্রেরণা নিয়ে কবি প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু সব জড়িয়ে এতদিনের অন্তরঙ্গতার ফলে কবির মনে প্রকৃতির প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের কোনো আভাস জেগে ওঠেনি। বার্ধক্যের শান্তির মধ্যে ভগবান্ প্রকৃতি ও মানবজীবনের নিবিড় অন্তরঙ্গতার উপলব্ধিতে, দীর্ঘ উপভোগের পরিতৃপ্তিতে, পূর্ণতর উপভোগের আকাঙ্ক্ষায়, আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, জীবনমৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রতি গভীর বিশ্বাসে কবির এযুগের প্রকৃতিপ্রেম বিচিত্র মাধুর্য লাভ করেছে। ভগবান্ প্রকৃতি ও মানবজীবনের গভীর সমন্বয়ের শান্তিতে তাঁর শেষজীবনের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পূর্ণ। কবির বিদায়ী চোখে প্রকৃতির আবেদন যেমন ফুরিয়ে যায়নি, তাঁর মনেও তেমনি আসন্ন মৃত্যু করাল

ছায়া ফেলেনি। হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে তিনি দুয়ের সমন্বয় করেছেন। শেষজীবনের সমস্ত কবিতাতেই কবির এই বিশ্বাস রূপ পেয়েছে।

ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।

—পরিশেষ, যাত্রী

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে,
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক্ স্থলে জলে
শুনি আদি ওংকার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

—বীথিকা, আদিতম

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।
আজ সব কথা,
মনে হয়, শুধু মুখরতা।

তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।

—জন্মদিনে, ১২

পুনশ্চ

পরিশেষের পর পুনশ্চ। এই দুটি কাব্যের নামকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে পুরাতন ধারার সমাপ্তি এবং নূতন ধারার সূচনার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু প্রদোষের মধ্যে অন্ধকারের সঙ্গে যেমন নিশান্তের আলোর আভাস মিশে থাকে, তেমনি পরিশেষে পুরাতনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতনত্বের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। পূর্বেই তার আলোচনা করেছি। পুনশ্চতে এই নূতনত্ব বিচিত্র প্রকাশ লাভ করেছে। পুনশ্চ নামটিতে কবির সচেতন প্রয়াসের স্বাক্ষর আছে। একাব্যটি বহুদিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য। পরিশেষ কাব্যের আলোচনায় পুনশ্চ কাব্যের মুখবন্ধ করা হয়েছে। ভাবগত নূতনত্বের সঙ্গে একাব্যটিতে ভাষা- ও ছন্দ-রীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এদিক্ থেকেও পুনশ্চ কাব্য মানসী বলাকা ইত্যাদির মতো রবীন্দ্রকাব্যের একটি দিগ্‌দর্শনী। কবির বিষয়বস্তু যেমন আভিজাত্য পরিহার করে অত্যন্ত সাধারণ এবং অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে নিবিষ্ট হয়েছে, ভাষা এবং ছন্দও তেমনি কাব্যের অলঙ্করণ এবং ছন্দের ঝঙ্কার ছেড়ে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার গদ্যরীতির কাছাকাছি এসেছে। 'ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালি'র মধ্যে সংযোগ ঘটেছে। কোপাই নদীর তীরের সাধারণ দৃশ্যগুলি কবির প্রেরণা যুগিয়েছে। তার গতির সহজভঙ্গিটি থেকে কবি আহরণ করেছেন কবিতার ছন্দ ও ভাষার স্বচ্ছন্দ অথচ শাণিত বেগ।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

—কোপাই

সাধারণ এবং অবজ্ঞাতের প্রতি এই আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে এসে দেখা দেয়নি। এই আকর্ষণ তাঁর কর্মের বহুমুখী প্রচেষ্টায় এবং তাঁর জীবনের প্রত্যেক পর্বেই আপনার পরিচয় রেখে গিয়েছে। এরই প্রভাবে তিনি লৌকিক চিত্রশিল্প এবং কলা ইত্যাদির উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন, লৌকিক ছড়া, রামপ্রসাদী সুর ইত্যাদিকে অভিজাত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, লৌকিক ছন্দকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন সাধু সাহিত্যের আসরে। তাঁর কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে উপেক্ষিতা নায়িকাদের প্রাত দরদ প্রকাশ পেয়েছে। উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে আকস্মিক নয়। তাঁর অসাধারণ সমানুভূতি আর বিচিত্র প্রয়াসের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই তাঁর কাব্যজীবনে এই নূতন ধারাটির বিকাশ ঘটেছিল। পুনশ্চ কাব্যটির সর্বত্র এই সাধারণের প্রতি আকর্ষণ।

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের পায়ে-দলা গরিব ধুলোর পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে,
ঘাসের পটের উপরে যেখানে বনের ছবি আঁকা।
সেবার বসন্ত এল।
কে জানবে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।...
দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে বেগনি ফুলে।
—শেষ দান

আমি মানুষ,
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।

কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে।···
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আমি যাই সকালে বিকালে,
দেখি, শিউলি গাছে কুঁড়ি ধরছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
—কীটের সংসার

পুনশ্চতে ছেলেটা, শালিখ, একজন লোক, ভীরু ইত্যাদি বহু কবিতায় অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে যে আনন্দ বা বেদনার স্পর্শ লাগে বৃহৎ জীবনেই তার অভিব্যক্তি নয়, ক্ষুদ্র জীবনেও সে অভিব্যক্তি কিছুমাত্র কম নয়। সাধারণের প্রতি আকর্ষণের ফলেই কবি এ সত্যটি লাভ করেছিলেন। সে অভিব্যক্তিতে বৃহৎ ক্ষুদ্রের প্রভেদ ঘুচে যায়, ক্ষুদ্রও বৃহতের মতোই প্রতিদিনকার তুচ্ছতার উর্ধ্বে রহস্যলোকে উন্নীত হয়।

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁর লাগে তান
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
—বাঁশি

কাছে এল পুজোর ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রং।··
দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার ভাঙা রাস্তায়
শহরের দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগলছানা
পাঁচটা ছটা করে ;
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের ঝালরদোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন করে বুঝেছে তারা
এল তাদের পুজোর ছুটির দিন।
—ছুটির আয়োজন

২

অস্পৃশ্য এবং পতিতদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ বহুবার তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে। কথা ও কাহিনীতে দীনদান, গীতাঞ্জলিতে দুর্ভাগা দেশ ইত্যাদি কবিতায় তার প্রমাণ আছে। এযুগে সাধারণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়েছে বলে আবার অস্পৃশ্য এবং পতিতদের নিয়ে তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। ভগবানের নিকট স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্যদের কোনো প্রভেদ নেই, অস্পৃশ্যদের দূরে সরিয়ে রেখে ভগবানের যে পূজা, তাতে অন্তর পরিতৃপ্ত হতে পারে না। শুচি, প্রেমের সোনা, স্নান সমাপন এই তিনটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভক্তসাধক রামানন্দের জীবন অবলম্বন করে এই ভাবটিকে রূপ দিয়েছেন। যিনি পতিত সাধারণকে ভাই বলে কোল দিয়েছিলেন সেই

যীশুখ্রীস্টের জীবনও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে মানবপুত্র এবং শিশুতীর্থ নামক কবিতায়। আমাদের আলোচনায় অবশ্য এ ধরনের কবিতাগুলির স্বতন্ত্র প্রাধান্য নেই, তবু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এযুগের প্রকৃতিকবিতাগুলির গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

শিশুতীর্থ কবিতাটি অন্যদিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য। এতে কবি মানবপুত্র যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালপ্রচলিত ধর্মের বীভৎসতা এবং যীশুখ্রীস্টের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। খ্রীস্টের জন্মের পূর্বরাত্রিটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি সে যুগের অন্ধকারময় দুর্যোগের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। খ্রীস্টজন্মের পূর্বরাত্রিটিতে জ্ঞানবৃদ্ধরা আশঙ্কাকুল হৃদয়ে একটি শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করেছিলেন। সে রাত্রির বিভীষিকাময় পটভূমি, আর খ্রীস্টজন্মলগ্নে অমিতাচারীর দৃপ্ত প্রতাপে মসীলিপ্ত সে-যুগের পটভূমি এক হয়ে গেছে।

পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো ;
স্তূপেস্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে ;
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি,
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।

—শিশুতীর্থ

বিভীষিকার রহস্যময় এই রাত্রির অবসান হল যে গৃহে, মানবপুত্র যীশু জন্মগ্রহণ গ্রহণ করেছেন তারই দ্বারপ্রান্তে এসে। সে প্রভাতের বর্ণনায় আশঙ্কা নেই, আছে নিশ্চিত সম্ভাবনার আভাস। পূর্বরাত্রির বর্ণনার সঙ্গে এই প্রভাতের বর্ণনাটি তুলনা করলে দুটিরই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রত্যূষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।...
পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।

—শিশুতীর্থ

মানবপুত্র যীশু সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন। কুমোর-কাঠুরিয়া-রাখালের কর্মপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ শান্তির মধ্যে মানবত্রাতার আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্যও কবিচিত্তকে প্রেরণা দিয়েছে। নূতন যুগের বাণীবাহক মহামানব এই সাধারণের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন, এই নিশ্চিত বিশ্বাসে প্রাচীনযুগের কাহিনীটিকে অনাগতযুগের আভায় অভিষিক্ত করে দেখেছেন।

কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।...
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।...
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়,
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, জয় হক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

—শিশুতীর্থ

৩

পুনশ্চতে আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল শাপমোচন। শাপমোচনের মধ্যে যে রূপক কাহিনী আছে রবীন্দ্রনাথ রাজা (১৩১৭), অরূপ রতন (১৩২৬) এবং শাপমোচন (১৩৩৮) নামক তিনখানি নাটকেও তাই ব্যক্ত করেছেন। বাহ্যিকরূপের আকর্ষণে, আসক্তিভরা মন নিয়ে আমরা যখন সুন্দরের সাধনা করতে যাই, তখন সুন্দর আমাদের আয়ত্তে আসে না। রূপের মোহ ছেড়ে যখন শুধু অন্তরের আকর্ষণে আমরা সুন্দরকে পেতে চাই, তখনই সুন্দর এসে আমাদের ধরা দেয়। কবির এযুগের প্রকৃতিপ্রেম বিশেষ-ভাবেই এ সত্যটির অনুকূল। বাহ্যিকরূপের আড়ম্বর নিয়ে যে সব দৃশ্যসম্পদ্ মুখর গৌরবে আপনাদের প্রকাশ করে, কবির নিরাসক্ত মন তাদের মোহে বাধা পড়ছে না। ভীরু গন্ধ নিয়ে আকন্দ, ক্ষুদ্র লিখনের সংকেত নিয়ে নাম-না-জানা বুনো ফুল তাই তাকে সুন্দরের আমন্ত্রণ জানিয়ে যায়। রূপহীন, গরিমাহীন সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদানের অন্তরে সৌন্দর্যের ফল্গু আবিষ্কার করেছেন বলেই নাটকে বর্ণিত কাহিনীটিকে তিনি এযুগে আবার নূতন করে কাব্যরূপ দিয়েছেন। শুধু রূপের আকর্ষণে কমলিকা যতদিন গান্ধারপতিকে দেখতে চেয়েছে ততদিন তার কুৎসিৎ মূর্তিই শুধু তার চোখে ধরা পড়েছে। 'কুশ্রীর পরম বেদনাতে সুন্দরের আহ্বান' তার হৃদয়ে সাড়া জাগায়নি। কিন্তু যেদিন রূপের মোহ ছেড়ে দিয়ে শুধু সংগীতের আকর্ষণে কমলিকা গান্ধারপতির অভিসারে বেরোল, কুশ্রীর অন্তরের সৌন্দর্যকে বাহ্যিক রূপের চেয়ে বড়ো বলে মেনে নিল, সেদিন কুশ্রীও তার চোখে পরম সুন্দর হয়ে উঠল, রূপকে উপেক্ষা করেই সে রূপবান্ গান্ধারপতিকে লাভ করল। সেদিন কমলিকার

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়েনা চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার'।

—শাপমোচন

আপাতদৃষ্টিতে রূপহীন প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে সুন্দরের স্পর্শ উপলব্ধি করেছেন বলেই শাপমোচনের কাহিনীটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রেরণা পেয়েছেন।

শেষসপ্তক

পরবর্তী শেষসপ্তক কাব্যের মধ্যেও অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে কালিদাসের মেঘদূতকাহিনীকে অবলম্বন করে। যক্ষ যতদিন তার প্রেমিকাকে একান্ত করে নিজের মোহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল ততদিন তাকে পূর্ণ করে পাওয়া তার ঘটেনি।

সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন করে হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারি আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।
—৩৮

কিন্তু যেদিন বিচ্ছেদের বেদনার মধ্য দিয়ে যক্ষ তার প্রিয়াকে পেল সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে, সেদিন তার পাওয়ার পরিপূর্ণতা ঘটল। সমস্ত প্রকৃতির সংগতির মধ্যে এই প্রাপ্তি ঘটেছে বলেই এ মিলনে সংকীর্ণতা নেই, মোহহীন নিরাসক্ত এই মিলনে বিচ্ছেদও নেই।

এমন সময় প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।

খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।

—৩৮

শুধু আপনাতে সমাপ্ত, আসক্তিপূর্ণ মিলনকে রবীন্দ্রনাথ কখনই চরম বলে মেনে নেননি। কিন্তু এযুগে কবিমনের আসক্তিহীনতার চরম প্রকাশ বলে এই কাহিনীকে নূতন করে স্মরণ করেছেন।

কবির প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যেও কবির নিরাসক্ত মনটি এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। বাহ্যিক রূপের মোহে তিনি যেমন আকৃষ্ট হচ্ছেন না, তেমনি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদানকেও তিনি বিরাট্ বিশ্বজগতের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে তার উগ্রতাকে কোমল করে নিয়েছেন। বিরহী যক্ষের মতো কবিও আসক্তিহীন দৃষ্টি নিয়ে তাঁর প্রকৃতিপ্রিয়াকে বিশ্বজীবনের ছন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ করে উপভোগ করেছেন। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যসম্পদের বিস্ময়গুলিও তাঁর চোখে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচি পাতা ;
সে যেন আপনি বিস্মিত।
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,
তেমনি দেখলেম ওকে।
অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ-আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয়।

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।...
আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।...
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে,
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
—২৩

২

দার্শনিকতা রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণার একটি বিশেষত্ব। তারই প্রভাবে তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনের মধ্যে কোথাও অনুভূতির একঘেয়েমি আসেনি। দীর্ঘকাল একজাতীয় উপভোগের পর নূতন একটি চিন্তার সূত্র ধরে তাঁর কবিমন পুরাতন অনুভূতি উত্তীর্ণ হয়ে নূতনত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের ক্রমবিকাশের ধারাগুলি এমন সুসংগত ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়েছে যে এই উত্তরণে কোথাও স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়নি। কিন্তু তবুও পূর্ববর্তী জীবনের একটি বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে উত্তরজীবনের একই ধরনের অনুভূতির পার্থক্যও কম নয়। সে পার্থক্য এসেছে চিন্তাধারার পরিণতিতে, উপলব্ধির রীতিপরিবর্তনে এবং প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতায়।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে একাঙ্গ অনুভূতির আনন্দ রবীন্দ্রনাথের জীবনে নূতন নয়। সোনার তরী চিত্রা চৈতালি উৎসর্গ ইত্যাদি কাব্যে তার অজস্র পরিচয় ছড়ানো রয়েছে। পরিশেষের যুগে সাধারণ বস্তুতে মন নিবিষ্ট হবার পরেও কবি অনুরূপ আনন্দের অনুভূতি লাভ করেছেন। পূর্বজীবনের আনন্দের সঙ্গে আজকের আনন্দের প্রভেদও স্পষ্ট। সাধারণ প্রকৃতির উপাদানে বিশ্বরহস্যের সুষমা নূতন করে

আবিষ্কার করার পরে প্রকৃতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন কবির কাছে অধিকতর লোভনীয় হয়েছে। তার অর্থও নূতনতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। শেষসপ্তক কাব্যটি এরূপ নিমজ্জনের আনন্দে ভরা। মনের অনাসক্তিও এযুগে তাঁর অনুভূতিতে নূতনত্ব এনে দিয়েছে।

চারিদিক্ থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।...
চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলসমনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।
—৪

এ শুধু সুন্দরের মধ্যে মোহময় মন নিয়ে ডুব দেওয়া নয়, চঞ্চল বসন্তের শেষে মোহমুক্ত মনে অস্তিত্বের সাধারণ ধারার মধ্যে আত্মনিমজ্জন।

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল,
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সত্ত মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।
—৮

শেষসপ্তক কাব্যে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। যদিও কবি বার্ধক্যের নিরাসক্ত মন নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাচ্ছেন তবু কবির এযুগের বর্ণনাগুলি নিছক বর্ণনা নয়। চিত্রকরসুলভ নির্লিপ্ততার সঙ্গে

যদিও দৃশ্যপটগুলি অঙ্কিত হয়েছে, তবু অতি সহজভাবেই কবি প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষেই একটি দার্শনিক সত্যের ধ্রুবত্বে এসে পৌছাচ্ছেন। এই দার্শনিক সত্যটি প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি সাধারণ উপাদানের মধ্যে বিশ্ব-ছন্দের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। নূতন মানসিক পটভূমি এবং নূতন পরিবেষ্টনীতে কবি আবার তাঁর চিরদিনের উপলব্ধ সত্যকে নূতন করে লাভ করছেন।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলছে গরুর গাড়ি।
কলসীতে নূতন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।...
পূবদিক্ থেকে রোদ্দ্‌রের ছটা
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে।
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেল শাখায়।
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকণ সবুজের আড়ালে।
—১১

নির্লিপ্ত দৃষ্টির অনুভূতি প্রভৃতি কবির শেষজীবনের সবগুলি বিশেষত্বই এই চিত্রটিতে সুন্দররূপে ধরা পড়েছে। তবু এটি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদন নয়, কবির চিন্তাশীলতার কাছেও এর আবেদন রয়েছে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চলে।

যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ করে
আপন আনন্দভাণ্ডার থেকে।
—১১

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে তিনি শুধু যে বস্তুবিশ্বের সঙ্গে সংগত করে দেখছেন তা নয়, বিরাট্ কালের অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিপ্রেক্ষিতেও তাদের নিবিড়তর রহস্যের সন্ধান লাভ করেছেন।

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভ আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।…
বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল
আঁকা হচ্ছে মোছা হচ্ছে।…
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে।
—২১

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছ ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত,
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।
এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নিচে

শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী—
'আমি আছি',
চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

—৩৬

কবির এ যুগের দার্শনিক দৃষ্টি শুধু যে প্রাকৃতিক উপাদানকেই মহাবিশ্ব-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছে তা নয়, নিজেকেও কবি প্রকৃতির মতোই সেই বিশালতার পটভূমিকায় নূতন করে দেখেছেন। তাই আপনার মধ্যেকার অসীম রহস্যের দিকে তাকিয়ে কবির আর বিস্ময়ের অন্ত নেই। কিন্তু কবির এই রহস্যময় 'আমি'বোধের মধ্যে কোনো উগ্র স্বাতন্ত্র্য নেই, অনন্ত মহাজীবনের বার্তা বহন করে অদৃশ্য পরিণতির দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির
মধ্যে মিলিয়ে ছিল
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।

—৩৬

বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।

দিন এগোল।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ-পথে ও-পথে।...
আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।
—৪০

বিপুল মহাবিশ্বের প্রবাহের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে কবির এই আত্মদর্শন বীথিকা কাব্যে আরও পরিপূর্ণ এবং আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

পুনশ্চ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য-ছন্দের রীতি আবিষ্কার করলেন, অবজ্ঞাত কোপাই নদীর ছন্দের সঙ্গে তার সাদৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। শেষসপ্তক কাব্যও সেই নূতন ছন্দেই লেখা, কবি কোপাই নদীর মতো তাঁর চারদিকের পরিবেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেও এই ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

পাঁচিলের এধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।...
এরা সব হাসে মধুর করে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে।...
পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।
পাশেই দুটি-তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।...
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে,
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।...

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
বললেম, 'টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।'

—২৫

বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব এযুগে স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত বেশি। শেষসপ্তক কাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনেই নয়, রূপকাত্মক প্রকৃতির চিত্রণেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। শাল, তাল, নিম, এবং চারদিকের জীবনযাত্রার ছবি ভিড় করে এসেছে এসব বর্ণনায়।

আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে।

—৪

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।

বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিমগাছের
ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি

—১৪

বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,
শালগাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে,
তবু এখনো
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।
—৩৩

শীতের রোদ্দুর
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুনবনে।
বেগনি ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরিনামা বৃদ্ধ বট
ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পর্যন্ত।
ফলসাগাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে
ধুলোর সাঙাত হয়ে।
—৩৬

আমার দু-চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘু-ডাকা দুপুরবেলায়
রাঙা পথের ওপারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চড়ে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে,
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে।
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গউদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।
—৪৪

পূর্বজীবনে পদ্মাতীরের শ্যামল পরিবেশ আর উত্তরজীবনে বীরভূমের গেরুয়া প্রান্তর, এই নিয়ে বাংলাদেশের একটি পরিপূর্ণ রূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আঁকা হয়ে আছে। একমাত্র শৈশবরচনা ছাড়া বাংলাদেশের বাইরের পটভূমিকা তাঁর কাব্যে খুব কমই আছে। সমুদ্র এবং পাহাড়কে কবি কি চোখে দেখতেন সে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি।[১] বিদেশে রচিত কবিতাতেও বিদেশী পরিবেশ কদাচিৎ দেখা দিয়েছে। ভিন্নজাতীয় পরিবেশের মধ্যে বসে কবি বাংলাদেশের শ্যামল মাটির স্বপ্নই দেখেছেন, সে মাটির রূপটি তাঁর কবিসত্তার অণুতে অণুতে মিশে ছিল। কবি বাংলার মাটিকে বহুবার প্রণাম জানিয়েছেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', কিংবা 'নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি' ইত্যাদি পংক্তিগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কল্পনা কাব্যেও বঙ্গজননীর সুন্দর মূর্তি কল্পিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে ঋণস্বীকারের প্রয়াস ততটা নেই, যতটা আছে রূপমুগ্ধতার বিস্ময়। এযুগে আবার কবি বাংলাদেশের শ্যামল রূপটি স্মরণ করেছেন। রূপমুগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটি থেকে জীবনব্যাপী প্রেরণা সংগ্রহের স্বীকৃতিও এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে ;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ঐ মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।
—৪৪

১ দ্রষ্টব্য ৭১ পৃষ্ঠা।

বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধতাকে এরকম প্রণতি পরবর্তী কাব্যেও কবি একাধিকবার জানিয়েছেন। শ্যামলী কাব্যের উৎসর্গ পত্রে আছে,

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি-ভরা
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।
—শ্যামলী, উৎসর্গ

অন্যত্র আপনার 'শেষ বেলাকার বাসা' শ্যামলীর প্রশস্তিতে কবি বাংলাদেশের শ্যামল রূপটি স্মরণ করেছেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি আর নারীপ্রকৃতির সাদৃশ্যটি তাঁর শেষ বেলাকার কাব্যে ধরা পড়েছে।

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ-করে থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।
—শ্যামলী, শ্যামলী

পত্রপুট কাব্যে বাংলাদেশের প্রতি কবির এই কৃতজ্ঞ প্রণতি গভীর হয়ে পৃথিবীর ধূলির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণামে পরিণত হয়েছে। সে কাব্যের আলোচনায় তার উল্লেখ করার সুযোগ পাব।

বীথিকা

বিশ্বরহস্যের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আত্মোপলব্ধি এবং কালের বিপুল প্রবাহের সঙ্গে সংগত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের মধ্যে বিরাটের স্পর্শসন্ধান শেষসপ্তক কাব্যে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। বীথিকা কাব্যে এই আত্মনিমজ্জন এবং রহস্য-উপলব্ধি আরও গভীর এবং বিশ্বের সকল বস্তুর সঙ্গে কবির সমানুভূতি আরও

প্রসারিত হয়েছে। সৃষ্টির সত্যরূপটি কবির কাছে শুভ্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান জীবনের 'ছায়াবীথিকায়' বসে কবি 'মহাঅতীতের' এবং অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছেন। সেই অনন্ত কালপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বসত্তার অখণ্ড রূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। কালের রূপহীন প্রবাহের মধ্যে খণ্ডসৌন্দর্য ও খণ্ডসত্যের পরিপূর্ণতা ঘটেছে, আপনার সফলতার জ্যোতিতে তারা দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মহাঅতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি,
দিবালোকঅবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে ;
যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ
তার তুলি
ম্রিয়মাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি ;
নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে সেখানে সে
গাঁথিয়া অদৃশ্য মালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে।
—অতীতের ছায়া

সেইখানে আছে পাতা
বিরাটের মহাসন কালের প্রাঙ্গণে
সর্ব দুঃখ, সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।
সেথা আকাশের পটে
অস্ত-উদয়ের শৈলতটে
রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া
তারি সঙ্গে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া।
—দুজন

প্রকৃতির বিচিত্র রূপ খণ্ড কালের ডালিতে তার স্বতন্ত্র সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশমান নয়, তার নিত্যকালীন অরূপ সত্তা কবির চিত্তে নূতন মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। বহিঃসৌন্দর্য থেকে মুক্ত হয়ে সে অন্তঃসৌন্দর্যের গভীরতর সত্যে প্রকাশিত হয়েছে।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময়।
—অতীতের ছায়া

কালপ্রবাহের রূপহীন বেগের কথা কবি পূর্বেও স্মরণ করেছিলেন বলাকা কাব্যে। সে চলার প্রচণ্ড আলোড়নে বুদ্‌বুদের মতো বস্তুবিশ্বের কায়াময় রূপটি উচ্ছ্বিত হয়ে ওঠে। খণ্ডকালের সীমার মধ্যেই মহাকালের বিচিত্ররূপ ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে, কিন্তু তার নিজের কোনো রূপ নেই। বীথিকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মহাকালের যে কল্পনা করেছেন, তার মধ্যেও কায়াহীনতার কথা আছে। কিন্তু তবু তার আছে একটি চিত্তময় রূপ, বলাকায় সেটি ছিল না। কালপ্রবাহের মত্ততা কবির পরিণত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, বীথিকায় মহাকালের প্রশান্ত রূপই অঙ্কিত হয়েছে।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে।...
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়।
—অতীতের ছায়া

যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,

সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
—রাত্রিরূপিনী

নবলব্ধ নিত্যতারুণ্যের অনুভূতিতে কবি নিজেও বলাকা কাব্যে কালের মত্ত প্রবাহের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিলেন। তাই ধাবমান জগৎ এবং জীবনের কেন্দ্রবর্তী ধ্রুব সত্তায় গভীর বিশ্বাস সত্ত্বেও কবি বলাকার অনেক কবিতাতেই তাকে প্রাধান্য দেননি। বীথিকাতে কিন্তু কবি এ জীবনের 'ছায়াবীথিকায়' বসে নির্লিপ্ত দর্শকের মতো কালের বিপুল প্রবাহের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাজেই আত্মোপলব্ধি এবং পারিপার্শ্বিকের সত্যমূল্য নিরূপণের অবসর পেয়েছেন যথেষ্ট।

তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।
সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে
আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে
তোমারি বিহারবনে ছায়াবীথিকায়।
—অতীতের ছায়া

বিশ্বের সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আরএকটি সূত্র এ যুগে তাঁর মনে প্রধান হয়ে উঠেছে। সেটি হল ক্ষুদ্রতম সত্তারও আত্ম-প্রকাশের বেদনা। সেই বেদনায় নিখিলবিশ্বের সঙ্গে কবির মিলনের অর্থ আরও রহস্যময় এবং গভীর হয়ে উঠেছে। 'ধরণীর ধূলি' থেকে 'তারার সীমা' পর্যন্ত এই আত্ম-প্রকাশের ধ্বনিহীন গান বেজে চলছে, কবিসত্তার মধ্যেও তারই অনুরণন। পূর্বজীবনে এ ভাবটির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নেই তা নয়, কিন্তু এ যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার সত্যরূপ এবং আত্মসত্তারও প্রকাশের বেদনাটি কবি সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,

তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন,
আকাশের বক্ষেতে বেজে ওঠে নিশিদিন,
মোর শিরাতন্তুতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গিতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।
—আদিতম

মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহো।
আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে,
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।
—প্রাণের ডাক

বীথিকায় আত্মোপলব্ধিতে কবির যে গভীরতা এসেছে তারই ফলে আবার তিনি সমস্ত অতীত এবং বর্তমান জড়িয়ে আপনার সমগ্র রূপটি বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াসী হয়েছেন। এই আত্মবিশ্লেষণ তাঁকে তাঁর কবিপ্রেরণার বিভিন্ন উৎসগুলির প্রতি আবার সচেতন করে তুলেছে। অতীত জীবনের স্মৃতি মন্থন করে তিনি ফিরে পেয়েছেন নারী আর প্রকৃতির সমন্বয়ে গড়া লীলাসঙ্গিনীর সান্নিধ্যস্পর্শ। সোনার তরী চিত্রা চৈতালি ইত্যাদির পর এই লীলাসঙ্গিনীটি আপনাকে সংকুচিত করে বিশ্বদেবতায় লীন করে দিয়েছিল। পূরবী কাব্যে পৃথিবীর আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় কবি আবার এই লীলাসঙ্গিনীকে ফিরে পেয়েছিলেন. বহুদিন পরে বীথিকা কাব্যে সে এসেছে আত্মসত্তার বিশ্লেষণের

১ দ্রষ্টব্য ১১৭ পৃষ্ঠা।

পথ ধরে। কিন্তু এখানে পূরবী কাব্যের লীলাসঙ্গিনীর বেশবদল ঘটেছে। তার এ-যুগের সাহচর্যের মধ্যে বেদনার পূরবীসংগীত নেই, আছে দীর্ঘ জীবনব্যাপী নিবিড় সান্নিধ্য এবং গভীর প্রেরণাসংগ্রহের কৃতজ্ঞ স্মৃতি-পরিক্রমা।

দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দনফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

—কৈশোরিকা

তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে।

—মাটিতে-আলোতে

পার্থিব প্রেমকেও কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সংগত করে উপলব্ধি করেছেন। তার পরিচয় পূর্ববর্তী বহু কাব্যে বিক্ষিপ্ত আছে। স্মরণ কাব্য নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করিনি। কল্পলোকের মানসীকে নিয়ে স্মরণ রচিত হয়নি। কাব্যটি লোকান্তরিতা পত্নীর স্মৃতিতে কবির শোকগাথা। এটিতে কবি পত্নীর স্মৃতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে আবার তাকে ফিরে পেয়েছেন।

আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মররাগিণী,
তোমার সে-কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা!

—স্মরণ, ১৬

বীথিকা কাব্যে লীলাসঙ্গিনীর মতো পৃথিবীর নারীও আবার কবিপ্রেরণাকে আহ্বান করেছে। কিন্তু বিগত জীবনের মতো সে আহ্বানকেও কবি দেহসীমার স্পর্শ থেকে ভাবনার স্বপ্নলোকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে স্থাপন করেছেন।

তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূর্তি তব
ছাড়ি তব অঙ্গসীমা আমার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী,
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতিবিজড়িত বেণী,
চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়।

—গীতচ্ছবি

পরিশেষ থেকে কবির কাব্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল পুনশ্চতে কবি নূতন ভাষা- ও ছন্দ-রীতির সাহায্যে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছেন। তার পর বীথিকার পূর্ব পর্যন্ত এই নূতন রীতিই তাঁর কাব্যের বাহন হয়েছিল। কিন্তু বীথিকাতে এসে কবি আবার রীতি পরিবর্তন করলেন। বীথিকায় অন্ত্যানুপ্রাস এবং পদ্য-ছন্দ অনুসৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী জীবনের বহু প্রেরণাও বীথিকায় আবার এসে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবুও পুনশ্চ থেকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর যে গোত্রান্তর হয়েছিল তা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কনে কবি এযুগের ধারাকেই অব্যাহত রেখেছেন।

পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের ক্বচিৎ আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকণ চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।

আমলকীতলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া গাঁথা,
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলাফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।
—সাঁওতাল মেয়ে

গদ্য-ছন্দ অনুসৃত না হলেও এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে কবির শেষ জীবনের প্রকৃতিপ্রেমের সবগুলি বিশেষত্বই ধরা পড়েছে।

পত্রপুট, শ্যামলী

পত্রপুট এবং শ্যামলীতে কবি আবার নূতন ভাষা ও ছন্দ-রীতেতে ফিরে এসেছেন। শ্যামলীর পরবর্তী কোনো কাব্যই আর আগাগোড়া গদ্য-ছন্দে লেখা হয়নি। এই দুটি কাব্যেই এই নূতন ছন্দ-রীতি সর্বাপেক্ষা পরিণত রূপ গ্রহণ করেছে। পুনশ্চতে ভাষার অলংকরণ এবং ছন্দের ঝংকার ছাড়তে গিয়ে কবি মাঝে মাঝে তাঁর ভাষাকে লালিত্যহীন করে তুলেছেন। পত্রপুটের ঠিক আগে বীথিকায় পুরাতন রীতিতে রচনার পর কবি যখন আবার গদ্য-ছন্দে ফিরে এলেন তখন নিরলংকার গদ্যের সঙ্গে পদ্যের লালিত্যের সংযোগে গদ্য-ছন্দের পরিণত রূপটিও নিয়ে এলেন। সুতরাং পত্রপুট কাব্যের পূর্বে বীথিকার আবির্ভাবের গুরুত্ব আছে।

শুধু ভাষা- এবং ছন্দ-রীতির দিক্ থেকেই নয়, কবির সাধারণ প্রেরণা এবং প্রকৃতিপ্রেমের বিচারেও পত্রপুট শ্যামলীর পূর্বে বীথিকা কাব্যের আবির্ভাবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমার পথে দেখেছি একটি বিশেষ ভাব বা বিশ্বাসের চরমরূপটি প্রকাশের ঠিক পূর্বে অথবা পুরাতন

ভাব উত্তীর্ণ হয়ে নূতনত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার সূচনায় কবি তাঁর বিগতজীবনের বিশেষ বিশেষ প্রেরণার একটি স্মৃতিলিপি রচনা করেন। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যের আগে তাই খেয়া এসেছে, পরিশেষ রচিত হয়েছে পুনশ্চ কাব্যের ঠিক আগে। তেমনি এযুগের একটি বিশেষ ভাবের পরিণতিও পত্রপুট এবং শ্যামলীতে চরমত্ব লাভ করেছে। সুতরাং প্রকৃতি এবং নারীর ভুলে-যাওয়া রূপের স্মৃতি আবার চকিত দীপ্তিতে বীথিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবুও এযুগের বিশেষ প্রেরণাটিও বীথিকার মধ্য দিয়ে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে।

নৈবেদ্যের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে যে জিনিসটার উপস্থিতি বিশেষ করে উপলব্ধি করেছেন সেটা হল সৌন্দর্য। রূপমুগ্ধতাই কবির এযুগের কাব্যকে বিশেষভাবে অভিষিক্ত করেছে। নৈবেদ্য থেকে কবি সেই সৌন্দর্যকে কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবার প্রয়াসী হয়েছেন। পরবর্তী গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে তাই আধ্যাত্মিক আনন্দের সঙ্গে রূপমুগ্ধতার সমন্বয় ঘটেছে। পরিশেষের যুগ থেকে কবি আবার প্রকৃতির মধ্যে ধ্রুব সত্য লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেও বৃহৎ সত্য উপলব্ধি করে তাদের মূল্য নিরূপণের প্রয়াস তাঁর এযুগের কাব্যের বিশেষ লক্ষণ। শেষসপ্তক কাব্যে আমরা দেখেছি প্রকৃতিবর্ণনায় মধ্যে তিনি থেকে থেকে একটি বিশেষ সত্যের ধ্রুবত্বে এসে পৌছাচ্ছেন। পত্রপুট কাব্যে সৌন্দর্য শিব আর সত্যের সমন্বয় ঘটেছে। এই সমন্বয়ের আনন্দ এবং বিস্ময় জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর উপলব্ধির মধ্যে সঞ্চিত ছিল। এই দিক্ থেকে পত্রপুটই তাঁর কবিজীবনের শেষপরিণতির নিদর্শন। পরবর্তী কাব্যগুলিতে এই পরিণত উপলব্ধিরই অনুরণন চলেছে।

প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সত্যপরিচয় এবং রহস্য উদ্ঘাটনের ফলে কবি আপনার অন্তরতম সত্তার মধ্যেও গভীর রহস্যের সন্ধ্যান পেয়েছেন। তাই যেমন একদিকে ধরণীর প্রতি গভীর প্রীতি, এর ক্ষুদ্র এবং নগণ্য অংশের মধ্যেও ধ্রুবত্বের ব্যঞ্জনা কবিকে আকর্ষণ করেছে, তেমনি কবিসত্তার এবং ব্যক্তিগত জীবনের সত্যমূল্যটিও কবি পর্যালোচনা করেছেন। আপনার সত্যপরিচয় জানবার এরকম গভীর আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধ্যে নিত্য-সত্তা উপলব্ধির এরকম প্রয়াস এতো গভীরভাবে অন্য কোনো কাব্যে প্রকাশিত

হয়নি। ভাবের গভীরতার সঙ্গে বাচনভঙ্গির প্রৌঢ়ত্বও এ-কাব্যটিতে ধরা পড়েছে। পরবর্তী শ্যামলীর সঙ্গে অন্য দিক্ থেকে এর অনেক প্রভেদ থাকলেও আত্মোপলব্ধির আনন্দ এবং ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে ধ্রুবত্বের অনুভূতিতে দুটি কাব্য একই সুরে বাঁধা।

এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।
—পত্রপুট, ৮

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
—শ্যামলী, আমি

কবির সঙ্গে বিশ্বজীবনের সৌন্দর্য আনন্দ এবং ধ্রুবত্বের সংযোগ ঘটেছে তার চেতনার বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে। সে উপাদানগুলি যেন 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট', তাঁর সংবেদনশীল মন এই পত্রপুটের অঞ্জলি মেলে মধু সংগ্রহ করেছে বিশ্বভুবনের রসধারা থেকে।

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারদিকে চিরকাল ধরে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লব স্তবক।...

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।
—পত্রপুট, ১৩

দেহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে মাঝে আত্মার স্বরূপটি ঢাকা পড়ে, প্রকৃতির রহস্যটি কবির চোখে ঝাপসা হয়ে আসে। প্রতিদিনের সূর্যের আলোকের অনুসরণ করে কবি আত্মার সত্যমূর্তিটি দেখবার প্রয়াসী, মনের ঘট ডুবিয়ে তিনি পারিপার্শ্বিকের থেকে প্রাণের রস ভরে নিতে চান।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
পত্রপুট, ১০

আমাকে শুনতে দাও,
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা;
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে
কণ্ঠের সঞ্চয় উজার-করে-দেবার গান।…
বিকেলবেলায় মেয়েরা জল ভরে নিয়ে যায় ঘটে,
তেমনি করে ভরে নিচ্ছি প্রাণের এই কাকলি
আকাশ থেকে
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে।
—শ্যামলী, প্রাণের রস

পৃথিবীর প্রতি কবির আকর্ষণ এযুগে আবার নূতন করে ব্যক্ত হয়েছে, সাধারণের মধ্যে অসীমের ধ্রুবত্ব উপলব্ধির পর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যসম্পদ্ থেকে

তিনি যে শুধু সৌন্দর্যই আহরণ করছেন তা নয়, পার্থিব ধূলির মধ্যে নিত্যসত্তার উপলব্ধিতে সব কিছুকে মধুময় করে দেখেছেন।

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা,
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া,
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।
বেদমন্ত্রের ছন্দে
আবার মন বললে,
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।
—পত্রপুট, ৫

পৃথিবীর প্রতি, বিচিত্ররূপিণী পার্থিব প্রকৃতির প্রতি কবির সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং তাঁর প্রণামসংগ্রহের স্বীকৃতি জানিয়েছেন কবি পত্রপুটের একটি কবিতায়। কোমল ও কঠোর, স্নিগ্ধ ও হিংস্র, পুরাতনী এবং নিত্যনবীনা পৃথিবীর এমন পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি আর কোনো কবির কাব্যে আঁকা হয়েছে কিনা সন্দেহ। ভাষার বৈভব এবং পরিণত ছন্দের ঝঙ্কার ভাবসমৃদ্ধ এই কবিতাটির উপযুক্ত বাহন হয়েছে। দীর্ঘজীবনে বহু অভিজ্ঞতার ফলে নিরাসক্ত কবিমনে এতদিনের সঙ্গিনী পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার আসন্নতার মধ্যেও কোনো মোহময় বেদনা নেই। এই পৃথিবীর অজস্র দানের সত্যমূল্য নিরূপণ, তার থেকে সৌন্দর্য- আনন্দ- ও রস-সঞ্চয়ের উপলব্ধিই কবিচিত্তকে অধিকার করে আছে।

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট্ প্রাণের, বিরাট্ মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
—পত্রপুট, ৩

প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ

নৈবেদ্য থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য প্রভৃতি কাব্যে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তাতে বিশ্বদেবতার লীলাবৈচিত্র্যই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু পরিশেষের পর থেকে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি নূতন পথ ধরেছে। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস এযুগে কবির কাম্য হয়ে উঠেছে। পূর্বে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে তিনি জন্ম-জন্মান্তরের একটি মিস্টিক রহস্য লাভ করেছিলেন। আর এযুগে আত্মার আবরণ উন্মোচন করে মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশরূপে তাব দিব্যমূর্তি দর্শনের অভিলাষী হয়েছেন। কবির এ বিশবত্বটি উপনিষদের চিন্তাধারার উত্তরাধিকার। উভয় যুগেই কবিপ্রেরণার মধ্যে প্রকৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে। লীলারস-পুষ্টির সহায়তা করবার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আধ্যাত্মিক জীবনে। পরবর্তী কালে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার মধ্যেও আত্মপ্রকাশের বেদনা এবং সৃষ্টির ধ্রুবত্ব দেখতে পেয়েছেন বলে আত্মার সত্যমূল্য নিরূপণে তার সহায়তা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবশ্য তার কোনো যুগেই ক্ষীণ হয়নি। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃতির রূপভেদ আমাদের কৌতূহলের সামগ্রী। শেষসপ্তক ইত্যাদি কাব্যের আলোনায় তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

কবির অধ্যাত্ম চিন্তাধারার বিকাশে এবং কবিজীবনের বিশ্বাসের সমগ্র রূপটিতে মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নিকটতম আত্মীয়ের বিচ্ছেদ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বিষাদ এনে দিয়েছে। কখনও আবার মৃত্যুর মধ্যে যে অনন্ত মহাজীবনের সন্ধান পেয়েছেন তারই প্রভাবে প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যেও ধ্রুবত্বের ব্যঞ্জনা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এবার আত্মার তথা প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের সত্যমূল্য নিরূপণের যুগে মৃত্যুর স্পর্শ এসেছে কবির নিজরই জীবনে। মৃত্যুর এই আভাস তাঁর আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিকে গভীরতর করেছে। প্রান্তিক কাব্যটি মৃত্যুর অঙ্গন থেকে ফিরে আসা কবির গভীর আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণ।

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে।...
বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

—প্রান্তিক, ১

কবির শেষজীবনের কাব্যে ত্যাগদীপ্ত রুদ্রের প্রসাদ কবি বিশেষভাবে কামনা করেছেন। তাঁব কাব্যের মূলপ্রেরণাও হয়েছেন নটরাজ। বীরভূমের রুক্ষ গেরুয়া পরিবেশ এবং বার্ধক্যের নিরাসক্ত মন এর পটভূমিকা রচনা করেছে। প্রান্তিকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে প্রকৃতিকে কবি উপলব্ধি করছেন গভীরভাবে, কিন্তু তার মধ্যে বৈরাগ্যের সুরটি পূর্বের থেকেও প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই শরতের একটি শান্ত প্রভাতকে কবি ত্যাগদীপ্ত সন্ন্যাসের পরিপূর্ণ মূর্তির সাদৃশ্যে স্থাপন করেছেন।

সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট্ ধুলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে। অনিঃশেষ যে-তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব দেহমনপ্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ঐ নিঃশব্দ প্রান্তরে
ছায়ারৌদ্রে হেথাহোথা যেথায় রোমন্থরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরস-সম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।

—প্রান্তিক, ৬

শেষজীবনে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সন্ন্যাসের উপাদান কবি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। এখানে তার চরম রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। এরকম নিরাসক্ত অথচ নিবিড় উপলব্ধি কবির প্রকৃতিপ্রেমের শেষ পরিচয় বহন করছে।

২

প্রান্তিকের পরবর্তী কাব্য সেঁজুতিও প্রান্তিকের মতোই আত্মোপলব্ধির নূতনত্বে পরিপূর্ণ। জীবনের সন্ধ্যাদীপের আলোকে কবি তাঁর চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছেন। সেই হিসাবনিকাশের মধ্যে আপনার একটি পরিপূর্ণ মূর্তি প্রকাশিত হচ্ছে কবির দৃষ্টির সম্মুখে। শেষসপ্তকের একটি কবিতায় ধরণীর প্রতি কবির শেষ নমস্কারে কবি শুধু বিচার করেছিলেন তাঁর নিজের জীবনধারণের সত্যমূল্য দিতে পেরেছেন কিনা। আজ জীবনের হিসাব খতিয়ে বিচার করতে গিয়ে তার সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে অতিক্রম করেও কবি আপনার স্বরূপটিকে অত্যন্ত বড়ো করে দেখতে পেয়েছেন। পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার সম্ভাবনায় যে বেদনার আভাস থাকতে পারত, আপনার অন্তরতম সত্তার জ্যোতির্ময় রূপের অন্তরালে সে বেদনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্যপানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে-মানুষ তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।

—সেঁজুতি, জন্মদিনে

মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে কবি আত্মার যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন ধরণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যসম্পদের সঙ্গে তার গভীর সুরও তিনি মিলিয়ে নিচ্ছেন। শেষজীবনের প্রকৃতিপ্রেমের বিশেষত্ব আরও গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই যে শিমুল, ওই যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে,
কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে

কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে। ..
যে-মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
—সেঁজুতি, যাবার মুখে

আমাদের দেশে প্রচলিত লৌকিক ছড়া এবং রূপকথা ইতাদির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের উল্লেখ করেছি। তিনি একদা ক্রমবর্ধমান বিস্মৃতি থেকে এদের উদ্ধারসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেও তিনি এদের যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। ছড়ার ছন্দকে তিনি সাধু-সাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করেছিলেন। শেষজীবনে ব্যাপকভাবেই তিনি ছড়াজাতীয় কবিতা রচনা করেছেন। খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়ার ছবি (১৯৩৭), ছড়া (১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থ পুরোপুরি ছড়াজাতীয় কাব্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে এ-ধরণের বহু কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই প্রাচীন ছড়াগুলির মধ্যে পুরাতন বাংলার একটি পরিবেশের ছবি আছে। সে ছবির মধ্যে পরিপূর্ণ চিত্রঅঙ্কনের প্রয়াস না থাকলেও চকিত রেখায় এবং ক্ষণিক বর্ণসমাবেশে আমাদের মনে একটি চিত্র জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় ছড়ার সুরের ঝংকার এবং ছড়ার জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশটি নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। সেঁজুতি কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে এই নূতন পরিবেশের ছবি আঁকা হয়েছে।

কোন্-সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর,
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'...
সেদিনও সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁজ-সকালের তারা।
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকা মহাজনি,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।
শান্ত প্রভাতকালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে,...

ডাঙায় উনুন পেতে
রান্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে,
শিয়াল ক্ষণে ক্ষণে
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউএর বনে বনে।
—সেঁজুতি, নতুন কাল

নতুন কালে আমাদের জীবনযাত্রার বহু উপাদান পরিবর্তিত হয়েছে, ভবিষ্যতে সেই পরিবর্তনের ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতেই বয়ে চলবে। বাংলার পল্লীর এই স্বাভাবিক দৃশ্যগুলি তবু বুঝি অপরিবর্তিতই থেকে যাবে, যুগান্তরের পরিবর্তনের মধ্য।দয়েও তাদের নিত্যস্বরূপটি তখনও চেনা যাবে।

প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পানসি রইবে বাঁধা।
তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর,
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'
—সেঁজুতি, নতুন কাল

৩

ছড়ার জগতের এই পরিবেশটি পরবর্তী আকাশপ্রদীপ কাব্যে আরও প্রাধান্য পেয়েছে। বধূ, সময়হারা, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে প্রভৃতি কবিতা সম্পূর্ণরূপেই এই বিশেষ ধরনে লেখা। তা ছাড়াও বহু কবিতায় ছড়া এবং রূপকথার পুরনো যুগটিকে সজীব করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

আকাশপ্রদীপ নামটির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কবির বিগতদিনের যে স্মৃতিগুলি স্বপ্নের আকাশে হারিয়ে গিয়েছে, আজ জীবনের গোধূলিবেলায় তিনি আকাশপ্রদীপ জ্বেলে সেই আকাশচারী স্মৃতিগুলির সন্ধান করে ফিরছেন।

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশপানে,
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।
—আকাশপ্রদীপ, আকাশপ্রদীপ

পুরনো দিনের স্মৃতিসন্ধান করতে গিয়ে তার কাছে বিগতজীবনের যে চিত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার মধ্যেও যেন রূপকথার মায়া জড়ানো। পুরনো স্মৃতির রূপকথা আর ছড়ার পরিবেশের সংস্মৃতি যেন এক হয়ে মিশে গিয়েছে। বর্তমান চেতনার আকাশপ্রদীপে কবি সেই স্মৃতিস্বপ্নগুলি ধরবার চেষ্টা করেছেন। বালককালের পরিবেশ আবার তাঁর স্মরণের মধ্যে ফিরে এসেছে রূপকথার মূর্তি নিয়ে।

কুলগাছ দক্ষিণ কুয়োর ধারে,
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে,
বাকি সব জঙ্গল আগাছা।
একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্নে ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে।…
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া।
—আকাশপ্রদীপ, স্কুলপালানে

বধূ, সময়হারা এবং ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, এই কবিতা তিনটিতে কবি শুধু যে ছড়ার জগতের পবিবেশকেই নূতন করে সৃষ্টি করেছেন তা নয়, সেই পরিবেশকে অবলম্বন করে তিনি বিশেষ বিশেষ চিন্তাতেও উপনীত হয়েছেন। দ্রুততালের একটি ছড়াকে অবলম্বন করে তিনি স্মরণ করেছেন সেই অজ্ঞাত রহস্যময়ী নারীকে, বিশ্বের রহস্যের মধ্যে যাঁর চরণধ্বনি অবিশ্রান্ত বেজে চলে।

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে,
ভাবখানা মনে আছে, 'বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে।
আমকাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোণার চরণচক্র পায়ে।'…
ফিরিছে সে চির পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।
—আকাশপ্রদীপ, বধূ

সময়হারা কবিতায় কবি নূতনযুগে তাঁর কাব্যসাধনার অনাদর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। নূতন রুচির কাছে তাঁর আর আদর নেই, তাই তিনি পুরাতন ছড়ার যুগের কবিদের দলে ভিড়ে গিয়েছেন।

খবর এল, সময় আমার গেছে
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই।
—আকাশপ্রদীপ, সময়হারা

পুরাতন পল্লীপ্রকৃতির ছড়ায় বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কবি নিজের অবসর যাপন করছেন। সেই পরিবেশটি তাঁর কাব্যে সজীব হয়ে উঠেছে, আপন খেয়ালের স্বপ্নে কবি সেই দৃশ্য উপভোগ করে চলেছেন।

এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে বলেই জানার সুযোগ হল,
'কলুদফুল' যে কাকে বলে, ঐ যে থলো থলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।
—আকাশপ্রদীপ, সময়হারা

তবু কবি জানেন তাঁর এই অবসর সময়ের এই স্বপ্নসাধা বিফল হবে না। পল্লীছড়াগুলি যেমন বহুযুগের উপেক্ষা অতিক্রম করেও অমর হয়ে আছে, তেমনি আধুনিক রুচিতে বাতিল তাঁর কাব্যও কালের শাসন পেরিয়ে চিরনবীন রূপ নিয়ে বেঁচে থাকবে।

বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল পাঁজি ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।
—আকাশপ্রদীপ, সময়হারা

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে কবিতার সূচনায় কবি একটি ছড়ার পরিবেশ ধার করে তাকে একটি রহস্যময় দুপুর বর্ণনার কাজে লাগিয়েছেন। ছড়ায় বর্ণিত স্থানের নামগুলি, ছড়ার সঙ্গে ঠাকুরমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সর্বোপরি ছড়ায় বর্ণিত আখ্যানের অংশটিকে কবি সংগত করেছেন এই বর্ণনার মধ্যে।

পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আসমানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
বেগনি-সোনা দিক্-আঙিনার কোণে
বসে বসে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুমলাগা রোদ্দুরে
ঝিমঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।
—আকাশপ্রদীপ, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

ছড়ার প্রতি কবির আকর্ষণ, তার রচিত পরিবেশের বিশেষত্ব এবং কবির পরিণত বর্ণনার আদর্শ সব কিছুই এই ক্ষুদ্র বর্ণনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই তিনটি কবিতায় ছড়া এবং রূপকথার সুরের ঝংকার আকাশপ্রদীপ কাব্যটিকে একটি বিশেষত্ব দান করেছে।

নবজাতক, সানাই

নবজাতক কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'আমার কাব্যের ঋতু-পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।... এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে'।

কবির বর্ণিত এই বিশেষত্বটি পরিশেষের যুগ থেকেই দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। নবজাতকে সহসা তার আবির্ভাব ঘটেনি। এর পরবর্তী কোনো কোনো কাব্যে মননশীলতাকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কল্পনালীলা প্রধান হয়ে উঠেছে। তবু মোটামুটিভাবে মননশীল তত্ত্বজিজ্ঞাসু কবিমনের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। নবজাতক তারই পরিণত রূপ। নিরলংকার স্বল্পভাষিতাও কবির শেষ যুগের কাব্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটি নবজাতকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে এবং পরবর্তী কাব্যগুলিতে এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু নবজাতক নামের বিশেষ সার্থকতাটি প্রকাশিত হয়েছে নবজাতক নামে প্রথম কবিতাটির মধ্য দিয়ে। এই নবজাতক কোনো একটি বিশেষ মানবত্রাতা নন। জগদ্ব্যাপী অত্যাচার ও অনাচারের রক্তপ্লাবনের পঙ্কিল পথে নূতনযুগের গণদেবতারূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। সেই আবির্ভাবের মধ্যে ভবিষ্যতে জগতের মুক্তি নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথেব এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে সমাজচেতনা যতই প্রবলভাবে জেগে থাকুক না কেন, প্রচলিত অর্থে সমাজতন্ত্রী দৃষ্টি তাঁর কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করেনি। মানুষের প্রতি মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবিচারের চেয়ে মানুষের পদতলে মানুষের আত্মার অবমাননায় তাঁকে বেশি ব্যথা দিয়েছে। সেই অপমানের মধ্যে সামাজিক অবিচার একটি অংশ মাত্র। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কল্পনা নবজাতকের মধ্যে সূচিত হয়েছে।

১ নবজাতক, সূচনা।

নবজাতকের কয়েকটি কবিতাতে কবি এযুগের রীতি অনুযায়ী আধুনিক যান্ত্রিকসভ্যতার কতগুলি উপাদানকে কাব্যসৌন্দর্য দান করেছেন। পক্ষীমানব, রেলগাড়ি ইত্যাদি কবিতাগুলি তার প্রমাণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রেমের বিচারে কোনো নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নবজাতক কাব্যে নেই।

তাঁর শেষজীবনের প্রকৃতিপ্রেমের বিশেষত্বে অবশ্য ছেদ পড়েনি। রোমানটিক নামক কবিতায় কবি আধুনিক বাস্তবতার প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবজগতের দৃশ্যসম্পদের প্রতি তিনি উদাসীন নন। প্রকৃতিকেও তিনি শুধু কল্পনালোকের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখেননি। কিন্তু তাঁর 'জন্মরোমানটিক' মন বাস্তব এবং সাধারণকে পরিশুদ্ধ করে ভাবলোকে উন্নীত করার প্রয়াসী।

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।...
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে॥

—নবজাতক, রোমানটিক

২

মৃত্যুর আসন্ন পদধ্বনির মধ্যে জগৎ এবং জীবনের তত্ত্বজিজ্ঞাসার থেকে মুক্ত হয়ে সানাই কাব্যে কবি আবার পরিপূর্ণ ভাবেই কল্পনালীলায় ফিরে এসেছেন। পূরবী এবং বীথিকা কাব্যের মতো তাঁর লীলাসঙ্গিনী আবার তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু নূতন বেশে সজ্জিত এই প্রিয়াকে কবি নূতন পরিবেশের মধ্যে আর পুরাতন দিনের মতো করে গ্রহণ করতে পারছেন না। পূরবীর মতো সানাই কাব্যেও মাঝে মাঝে তাই করুণ বিষাদের সুর লেগেছে।

আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া

কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া,
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া।
—সানাই, মায়া

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির অঙ্গে লীন পার্থিব প্রিয়ার সুদূর স্মৃতিও পূরবী এবং বীথিকার মতোই আবার সানাইএর কোনো কোনো কবিতায় ধরা পড়েছে।

যেমন মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ণ সাধনাকে, তেমনি প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যকেও রবীন্দ্রনাথ চিরজীবনই এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে রেখে তাদের মধ্যে একটি পরম শান্তি উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এযুগের পারি-পার্শ্বিকের নানারূপ বীভৎসতার মধ্যে বুঝি প্রকৃতির সেই শান্তরূপটির অপঘাত মৃত্যু ঘটে।

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে।
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালিবোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়িবাঁধা বাছুর চলিছে।...
আশে-পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে।...
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।
—সানাই, অপঘাত

এই শান্ত পরিবেশের সৌন্দর্য হঠাৎ সুদূর পশ্চিমের যুদ্ধোন্মত্ত নারকীয়তার খবরে বুঝি অকস্মাৎ ব্যর্থ হয়ে যায়

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।
—সানাই, অপঘাত

মনে হতে পারে কবির চিরজীবনের বিশ্বাসও বুঝি বীভৎসতার রূঢ় আঘাতে ফিনল্যাণ্ডের মতো চূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তা নয়। সানাই কবিতায় কবি এই কুশ্রীতার সুর ছাপিয়ে বিশ্ব-সানাইএর ঐক্যধ্বনি শুনেছেন। এই কবিতাটির নামেই সমস্ত গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে।

গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙারাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
উর্ধ্বে তুলি কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
—সানাই, সানাই

কিন্তু এই ধূম্রমলিন ছন্দভাঙা দৃশ্যের মধ্যেও ঐক্যের সুর বেজে চলেছে।

এ সমস্ত ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।...
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।
—সানাই, সানাই

সানাইএর অন্য আরও কয়েকটি কবিতায় এই একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। নীরস কঠিন বাস্তবকে তিনি ভাবলোকের অমৃতত্বে উপনীত করে দিয়েছেন। শেষের জীবনের কাব্যে এই ভাবটি ক্রমেই গভীরতর হয়েছে।

রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা

জীবনের বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নানা আনন্দের স্পর্শে এবং নানা দুঃখবেদনার সংঘাতে কবির মন একটি পরিপূর্ণতা এবং গভীর ঐক্যের দিকে বেড়ে উঠছিল তা আমরা কবিজীবনের প্রতিপর্বেই লক্ষ্য করেছি। জগৎ এবং জীবনকে কবি এই ঐক্যানুভূতির প্রভাবেই নিবিড় করে উপলব্ধি করেছেন, আবার এই অনুভূতিই কবির উপলব্ধির মধ্যে নিরাসক্তি এনে দিয়েছে। প্রান্তিক কাব্যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে কবির এই ভাবটি গভীরতর হয়েছিল। রোগশয্যা থেকে আরম্ভ করে কবির শেষ চারটি কাব্যে অনাসক্ত উপলব্ধির গভীরতম রূপ দেখতে পাই। নানা সঞ্চয়ের ক্ষণিকতা অতিক্রম করে জীবনের চরম সার্থকতা এবং আত্মার ধ্রুবত্বের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসে পৃথিবীর সৌন্দর্যকে তিনি আবার নূতন দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু কোনো আসক্তি তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাই বেদ এবং উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো তাঁর আনন্দের মুহূর্তগুলি পরম সত্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল,
আনন্দঅমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক॥

—রোগশয্যায়, ২৫

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,

এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

—আরোগ্য, ১

আজি এ প্রভাতকালে, ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।

—জন্মদিনে, ১৩

কবির মন যেমন সরল সত্যের আলোকে আসক্তিহীনতার গৈরিক রঙ ধারণ করেছে, কবির কাব্যের ভাষা এবং বাহ্যিক কলাকৌশলও তেমনি নিরলংকার এবং নিরাভরণ রূপ নিয়েছে। চীনদেশীয় গীতিকবিতার মতো ক্ষুদ্রায়তন এযুগের এক একটি কবিতা সুতীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনার সাহায্যে কবির উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছে— ভাষা বাহুল্যবর্জিত, ছন্দে বিলাস নেই, এবং বলবার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ-ভাবে হৃদয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

রোগশয্যায় কাব্যে তীব্র রোগযন্ত্রণার হোমানলে পুড়ে কবি আপনার অভিজ্ঞতার সাহায্যেই মানবাত্মার অপরাজেয় মহিমা উপলব্ধি করেছেন। আরোগ্য কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবপ্রেমের নূতনতম আস্বাদ এবং এই স্নেহের নীড় থেকে চিরবিদায়ের জন্য প্রস্তুতির বৈরাগ্য কবির মনে সংগত হয়েছে। জন্মদিনে কাব্যে কবি এই পার্থিব জন্মদিনকে অতিক্রম করে মৃত্যুর অতীত নব জন্মদিনকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

সকল আলোর অন্তরালে
বিস্মৃতির দূতী
খুলে নেয় এ মর্ত্যের ঋণকরা সাজসজ্জা যত,
প্রক্ষিপ্ত যা-কিছু তার নিত্যতার মাঝে
ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস।
আঁধারে অবগাহন-স্নানে
নির্মল করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে।

জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যপথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে॥

—জন্মদিনে, ২৭

শেষ লেখাতে এই জীবন পার হয়ে অন্তিম রহস্যপথে যাত্রা করেছেন। পটভূমিকার এই প্রভেদ সত্ত্বেও কবির বিশ্বাসের গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা এই চারটি গ্রন্থকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে, মনে হয় যেন গ্রন্থগুলি একই কাব্যের বিভিন্ন সর্গমাত্র।

২

কবির প্রৌঢ় অনুভূতি নৈবেদ্যের যুগ থেকে যে অতিপার্থিবতার সাধনা আয়ত্ত করেছিল, উত্তরজীবন তাই ক্রমবর্ধমান সাফল্য লাভ করেছে। শেষের দিকের কাব্যপ্রচেষ্টায় লীলাসঙ্গিনীর পরিবর্তে ত্যাগদীপ্ত রুদ্র তাঁর মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কল্পনা, বনবাণী প্রভৃতি কাব্যে বাইরের রূপলোক আর কবির অন্তর-আকাশ জুড়ে এই নটরাজ রুদ্রের পদক্ষেপ-ছন্দ শুনেছি। কিন্তু এই কাব্য চারটিতে নটরাজের নৃত্যতালের পরিবর্তে রুদ্রের ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্যই প্রাধান্য পেয়েছে, বাহ্যিক লীলাবৈচিত্র্যের চেয়ে তাঁর অন্তর্লোকের অবিচলিত স্থৈর্যই বেশি করে চোখে পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় এবং রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সংস্থানেও সন্ন্যাসের গেরুয়া রঙ লেগেছে।

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়॥

—রোগশয্যায়, ১

প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে ॥

—রোগশয্যায়, ৩

বিরাট্ সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে। ··
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী ॥

—আরোগ্য, ৯

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারিদিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী ॥

—আরোগ্য, ১৩

ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যত যায় স্খলি
প্রহরের কর্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি
খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার
অন্ধকার-আলোকের সাগরসংগমে।
দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে,

চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয়
করিতে মগন।

—আরোগ্য, ৩০

ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রস্তর-আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।

—জন্মদিনে, ৭

যে রহস্যদিদৃক্ষার ফলে এই খণ্ডজীবনের যবনিকা তুলে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর অতীত অনন্ত মহাজীবনের রূপের সন্ধান করেছেন তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ধরাছোঁয়ার অতীত অরূপলোকের আভাসও দিয়ে গিয়েছে। দেখা রূপ এবং অদেখা ইঙ্গিত সংগত হয়ে তাঁর মনে পরিপূর্ণতার একটি অখণ্ড চিত্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জগৎ এবং জীবনকে তিনি যতদিন উপভোগ করেছেন ততদিন এই অরূপ জগৎ তাঁকে শুধু দূর থেকে বার্তা পাঠিয়েছে। আজ তিনি যখন মৃত্যুত্তীর্ণ অনন্ত জীবনের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন তখন যেন সে অরূপ জগৎও তাঁর চেতনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। পার্থিব রূপরসগন্ধের সৌন্দর্য-অঞ্জন অবশ্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর চোখে লেগে ছিল। তবু তিনি যেন মৃত্যুকে পার হয়ে নূতন জীবনের ভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাই প্রকৃতির রূপের বর্ণনা থেকে ক্ষণে ক্ষণে অরূপ জগতের ব্যঞ্জনায় চলে যাচ্ছেন। সে ব্যঞ্জনার রহস্যময়তা পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে, তবু তাঁর উপলব্ধির প্রত্যক্ষতা যেন পূর্বের থেকে অনেক বেড়েছে।

রোগদুঃখ-রজনীর নিরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি,
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।…

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি।...
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে ॥

—রোগশয্যায়, ২০

একা বসে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।...
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহুদূর ॥

—আরোগ্য, ৮

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।...
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা...
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব ॥

—জন্মদিনে, ১১

কিন্তু মৃত্যুর তোরণে অনন্ত মহাজীবনের ভূমিকায় এসে দাঁড়ালেও রবীন্দ্রনাথের কাছে পার্থিব জীবনের রহস্য, প্রকৃতির অজস্র সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এটাই হয়তো জগৎ এবং জীবনের কবি হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা। পৃথিবীর শেষ স্পর্শের মধ্যেও তিনি অসীমের ইঙ্গিত নিয়ে গিয়েছেন। অনন্ত মহাজীবনের পথে এই পার্থিব সত্তা

একদিন বিকশিত হয়ে ওঠে, সীমার দেহ নিয়ে সে অসীমের রহস্যকে লালন করে। জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতার শেষেও নিজের কাছেই তার স্বরূপের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। এক রহস্যের থেকে আর এক রহস্যের দিকে প্রসারিত তার এই যাত্রা যদি কখনও শেষ হত তবে সত্তার সসীমত্ব এতদিনে মানুষকে পীড়িত করতে থাকত। অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের আলোয় প্রত্যেক সত্তা চিরউজ্জ্বল।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেলনা উত্তর॥
—শেষ লেখা, ১৩

আপনার সত্তাতেও কবি এই রহস্যময়তার সন্ধান পেয়েছেন, তাই আপনাকে জানা তাঁর নিঃশেষ হয়নি।

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।...
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,

চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে॥

—জন্মদিনে, ২

প্রকৃতির মধ্যেও এই 'অব্যক্তের বিরাট্ প্লাবন' তাঁর বিদায়ী চোখে রহস্যের সুষমা তুলে ধরেছে। পার্থিব জীবন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবার প্রস্তুতির মধ্যে যে বৈরাগ্য আছে, তা তাঁর পার্থিব প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। এ জগতের প্রভাতসন্ধ্যাকে কবি জীবনসায়াহ্নের অবসন্ন আলোকে নূতন অর্থমণ্ডিত করে দেখেছেন।

অবসন্ন আলোকের
শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা,
সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা
স্তব্ধ তার হৃদয়গহনে,
প্রতিক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্রূষা।...
দেখিলাম, ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালিকুসুমরুচি আলোর থালায়॥

—রোগশয্যায়, ১৬

এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা।
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট্ গোলাপ॥

—রোগশয্যায়, ২১

দীর্ঘজীবন ধরে বিচিত্র ছন্দে, সপ্রভ ভাষায় কবি প্রকৃতি এবং জীবনের সৌন্দর্য ও রহস্যের রূপ দেবার প্রয়াস করেছেন, সে প্রয়াসের সফলতা তাঁকে অজস্র পুরস্কারও দিয়েছে। কিন্তু জীবনের শেষক্ষণে প্রকৃতির মধ্যে কবি যে নূতন রহস্য দেখতে পেলেন কবির ভাষা তার রূপ দিতে গিয়ে যেন থেমে গিয়েছে, প্রকাশরীতির সসীমতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে।

রহি আমি দু চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন উর্ধ্বপানে চেয়ে।...
মনে হয়, বৃথা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই ;
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই ॥

—রোগশয্যায়, ৩২

কখনও আবার কবি আপনার কণ্ঠে বৈদিকমন্ত্রের বাণী আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাঁর ভাষা বিশ্বরহস্যের যতটুকু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে বৈদিকমন্ত্রের সাহায্যে হয়তো সে ব্যবধান অতিক্রম করা সম্ভব হত।

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
ভাষা নাই, ভাষা নাই ;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

—আরোগ্য, ৩

এই ব্যর্থতার বেদনার মধ্যে বিশ্বরহস্যের অসীমত্বের যে ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে সেটা তাঁর জগৎ এবং জীবনের প্রতি গভীরতম প্রেমের পরিচায়ক। অনন্ত মহাজীবনের ভূমিকায় দাঁড়িয়েও কবি এই জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলি, এ জগতের সৌন্দর্যের সঞ্চয়গুলিকে চিরদিনের মতোই নিবিড় করে উপলব্ধি করেছেন। বহুদিনের ভুলে-যাওয়া দৃশ্যগুলিও অবসর সময়ের অলস চিন্তার স্রোতে তাঁর বর্তমান চেতনার তটে ভেসে এসেছে। শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থে তাই অতীত জীবনের স্মৃতিবোধনও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আরোগ্যের একটি কবিতায় ঘণ্টার শব্দকে অবলম্বন করে কবি আবার ফিরে গিয়েছেন অতীতজীবনের বহু বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে। জীবনের জটিলতার অন্তরালে যে দৃশ্যগুলি নিতান্ত অনতিগোচর হয়ে ছিল সেগুলি আজ অতি স্পষ্ট রূপ ধরে কবির মনকে বর্তমান থেকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে ॥

—আরোগ্য, ৪

প্রকৃতি এবং জীবনের সঙ্গে কবির নিবিড় প্রেম এই পার্থিব জীবনের সত্যতা সম্বন্ধে কবিকে নিঃসংশয় করেছে। মৃত্যুর অতীত নূতন জীবনের যাত্রাপথে তিনি বিচ্ছেদবেদনাকে জয় করেছেন, পৃথিবীর প্রতি মোহময় কোনো আসক্তি সে যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেনি।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট্ বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার ॥

—শেষলেখা, ১

কিন্তু তবুও এ পার্থিব জীবনের সত্যমূল্য তিনি অন্তিম যাত্রার পথেও ভুলে যাননি। আপনার সত্তার বিকাশে এই জগৎ ও জীবন তাঁকে যে অপরিসীম ঋণে বেঁধেছে কবি তাকে স্মরণ করেছেন অননুকরণীব ভাষায়।

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

—শেষলেখা, ১১

রূপজগতের প্রতি অজানার পথযাত্রী কবির এই শেষপ্রশস্তি।

রবীন্দ্রকাব্যে ঋতুচক্র

ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে কবিপ্রতিভার মূল অবলম্বন হল প্রকৃতি, মানবজীবন এবং ভগবৎ-ভক্তি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যতীর্থ পরিক্রমার পথে পথে আমরা দেখছি এই তিনটি ধারার সমন্বয়ে তাঁর কবিজীবনের বিশ্বাস এবং সাফল্যের বিশেষ ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর মনে মানবজীবন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ভগবানের স্পর্শ এসেছে প্রকৃতির মধ্যস্থতায়। ব্যক্তিগত প্রেমের সৌরভও তাঁর কাছে প্রকৃতির দেহসৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ প্রকৃতিরই কবি। আয়তনের দিক্ থেকে যেমন, গভীরতায়ও তেমনি প্রকৃতিই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য তাই তাঁর কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষে ঋতুবিভাগের প্রাকৃতিক স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট, অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের জীবন ও সাহিত্য তার পরিচয় বহন করছে। আমাদের সামাজিক জীবনের কর্মকুশলতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের কবিত্বময় অনুভূতি এই ঋতুবৈচিত্র্যের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের অনুষ্ঠান অংশে ঋতুউপভোগেরও প্রচেষ্টা ছিল তার প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। কালক্রমে ঋতুবৈচিত্র্য উপভোগের ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি কবিসাধারণের বহুব্যবহৃত সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। উৎসবের অঙ্গে ঋতুপূজার সচেতন প্রচেষ্টাও অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধসংস্কার থেকে উদ্ধার করে আমাদের কাব্যানুভূতিকেও যেমন আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকেও তেমনি এক নূতন মুক্তিতে অভিষিক্ত করে তুলেছেন। তাঁর গান এবং ঋতুনাট্যগুলিতে এর অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। বিভিন্ন দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির স্বতন্ত্র মূল্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুষ্ক অক্ষরের বন্ধনে গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য যাচাই করতে গেলে অনেক মহল থেকে আপত্তি উঠবার সম্ভাবনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সুর-নিরপেক্ষ ভাবেই প্রচুর আবেদন রয়েছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি মূলত সংগীতগ্রন্থ তবু কাব্যরূপেই এগুলি স্বদেশে এবং বিদেশে আদৃত হয়েছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের বহুগানের

সুর বাঙালির কানে এত পরিচিত যে সেগুলি পাঠ অথবা আবৃত্তি কালেই তার সুরের সংস্মৃতিটি পাঠক এবং শ্রোতার কানে বাজতে থাকে, সেগুলিকে সুরহীন শুষ্ক লেখা বলে মনেই হয় না। কাজেই অঙ্গহানি করার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়েই রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলির সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করার প্রয়াসী হওয়া চলে। অজস্রতা এবং গভীরতা উভয়ের বিচারেই রবীন্দ্র-সংগীতের তুলনা নেই। তাঁর কাব্যের যে বিশেষ বিশেষ গুণ তাঁর সংগীতের মধ্যেও সেগুলি পরিপূর্ণরূপেই প্রতিফলিত হয়েছে। বরং অনেক স্থলে যেখানে কথা থেমে গিয়েছে, কথা দিয়ে যে গভীরতার নাগাল পাওয়া যায়নি, সুরে-বসান কথা বা গান দিয়ে তিনি সে গভীরতার স্পর্শ পেয়েছেন। এ-আলোচনায় অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু ঋতুউপভোগের ক্ষেত্রে তাঁর গানগুলির অসামান্যতার পরিচয় সংগ্রহ করব।

পূর্বেই বলেছি, প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবাসী ঋতুবৈচিত্র্যকে তাদের সাহিত্যের মধ্যে ধরে রাখবার প্রয়াস পেয়েছে। রামায়ণে, কালিদাসের কাব্যে, জয়দেবের রচনায় ঋতুবর্ণনার বৈচিত্র্য, সমারোহ এবং গভীরতা সবকিছুরই পরিচয় পাওয়া যাবে। শক্তিশালী কবিদের কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ঋতুর একটা বিশেষ রূপ এবং পরিচয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কবিদের রচনা তারই অনুকরণ। প্রথম যুগ থেকেই ঋতুবর্ণনার একটা বাঁধাধরা সংস্কার, ঋতুদৃশ্যের উপাদানগুলির সমাবেশে বৈচিত্র্যের অভাব এমন কি ঋতুবর্ণনার সংস্থানে একটি চিরাচরিত রীতি বাঙলাকাব্যকে পীড়িত করছিল। সে বর্ণনাতে সমারোহ ছিল কিন্তু স্বকীয়তা ছিল না। বৈষ্ণবকাব্য-গুলিতে ঋতুদৃশ্য সংস্থানের প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বকীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাকাব্যে যে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তারই পরিণতি। ঋতুবর্ণনার প্রাচীন সংস্মৃতিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সযত্নে পরিহার করেছেন এমন নয়, বরং তাঁর কাব্যের পরিবেশরচনায় তাদের সাহায্য তিনি অপরিহার্য বলেই মনে করেছেন। পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে তিনি কালিদাসের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কাব্যের ঋতুর পরিবেশ শুধু পূর্ববর্তীদের নির্জীব অনুকরণ নয়, ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শে

সজীব। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে তিনি যেমন ঋতুবর্ণনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন, পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকেও তেমনি। বিভিন্ন ঋতুদৃশ্যের যে সংস্মৃতিগুলি আমাদের উত্তরাধিকার তারা রবীন্দ্রনাথের কবিমনের কাছে নূতন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করেছে। তাঁর ভাবনার আকাশে তিনি 'শতেক যুগের কবিদল' কে আহ্বান জানিয়েছেন; কিন্তু সে আকাশটি তাঁর নিজেরই রচনা। 'শতেক যুগের কবিদল' সে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেননি, কবিমনের স্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্য সেখানে বিস্তীর্ণ অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া বিশেষভাবে নূতনযুগের দৃষ্টিতে বাঙলাদেশের ঋতুগুলিকে দেখে তার জন্য নূতন সংস্মৃতিও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। আজ বিভিন্ন ঋতুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের মন রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও উত্তরাধিকার বহন করছে।

পূর্বে বহুবার একথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বিশেষত্ব হল প্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের অভিন্ন অস্তিত্বের অনুভূতি। কৈশোরে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার কালেই দেখেছি কবির 'মরমে ফুটই ফুল'। বাইরের বসন্তদৃশ্যের ফুলফোটার উৎসব কবিকে শুধু আনন্দিত করেনি, বসন্তের আনন্দের সঙ্গে গভীর একাত্ম অনুভূতিতে কবির হৃদয়েই যেন ফুল ফুটেছে। ঋতু উপভোগে কবির এই বিশেষ অনুভূতিটি তাঁর কাব্যজীবনকে অজস্রতায় ভরে রেখেছে। বর্ষার বারিধারাপাতে উদ্‌গত নূতন তৃণ দেখে তার হৃদয় শুধু হর্ষে ভরে উঠেনি, তিনি 'নবতৃণদলে ঘন বনছায়ে' তাঁর হর্ষকে বিছিয়ে দিয়েছেন, বসন্তের 'রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে' তাঁর লীলাসঙ্গিনীর 'অরূপমূর্তিখানি' বসিয়ে শুধু দিগন্তের আনন্দের মূর্চ্ছনা শুনেই তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি, নিজেই সুদূর দিগন্তে বসে বাঁশি বাজিয়েছেন।

বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে, সুদূর দিগন্তে।[১]
—আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি

বিদায়ক্ষণে আপনার হৃদয়বেদনার সঙ্গে ঝরা যূঁথীর পাপড়ির সাদৃশ্যটুকুই

১ যে গানের প্রথমপংক্তি উদ্ধৃতির মধ্যে রয়েছে তাছাড়া অন্যগুলির পরিচয় নির্দেশ করবার জন্য উদ্ধৃতির শেষে গানের প্রথম পংক্তির অংশ দেওয়া হল।

শুধু কবির অনুভূতির সঞ্চয় নয়, নিজের বেদনাকে ঝরা যূঁথীর বেদনার সঙ্গে কবি অভিন্ন করে দেখেছেন।

ঝরা যূঁথীর পাতায় ঢেকে
আমার বেদন গেলেম রেখে।
—ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অভিন্ন অস্তিত্বের এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের ঋতুউপভোগের রীতিতে একটি স্বকীয়তা দিয়েছে।

বিভিন্ন ঋতুকে পুরুষ বা নারীরূপে কল্পনা করে তার একটি বিশেষ মূর্তি গড়ে তোলার রীতি প্রাচীন। বর্ষা বসন্ত এবং শরতের এই রূপগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ এই দৈহিকরূপের সঙ্গে ঋতুগুলির এক-একটি ভাবরূপও যুক্ত করে দিয়েছেন। কলিদাসের কাব্যে মানবমনের উপর বিভিন্ন ঋতুর গভীর প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সে প্রভাব বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ভাবানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। পূর্ববর্তী অংশে প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এ-কথার আলোচনা করেছি।

২

প্রকৃতির দেহে বিভিন্ন ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রমাণ তাঁর রচনার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তাঁর কবিজীবনে 'চলার পথের আগে আগে ঋতুর ঋতুর সোহাগ' জেগেছে। কবি-জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ঋতু প্রাধান্য পেয়েছে। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং গীতালিতে কি করে বর্ষা বসন্ত এবং শরৎ প্রাধান্য লাভ করেছিল তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।[১] বর্ষা-বসন্ত-শরতের প্রতি কবির বিশেষ পক্ষ-পাতিত্ব থাকলেও ঋতুচক্রের কোনটিই তাঁর কাব্য সাধনায় পরিত্যক্ত হয়নি। ঋতুসংহার-এ বর্ণিত ঋতুচক্রের প্রত্যেকটি ঋতুর প্রতি কালিদাসের কবিদৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ প্রণাম জানিয়েছেন। প্রাচীন কবির প্রেমবাসরে এই ছয় ঋতুর নৃত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

১ দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৪৩।

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্যসিংহাসন-'পরে।...
ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি,
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে।

—চৈতালি, ঋতুসংহার

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা এবং ঋতুরঙ্গ নামক গীতিনাট্যে কবি ঋতুচক্রের আবর্তনকে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের বৃহৎ ভূমিকায় স্থাপিত করে উপভোগ করেছেন। কবির শেষজীবনের কাব্যে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির অধিদেবতার যে পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে সেটি নটরাজের। ঋতুচক্রের আবর্তনও এই নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিশ্বের গতিচ্ছন্দের মতো তাই ঋতুর চলার ছন্দেও একটা ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয়ের সুর আছে। এক ঋতুতে বিশেষ ফুলের এবং ফলের শাখা রিক্ত হয়ে যায়, অন্য ঋতুর সূচনায় আবার অন্য ফুলেফলে ঋতুর ডালা পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই রিক্ততা এবং পূর্ণতার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। উভয়ের মিলনেই ঋতুচক্রের সম্পূর্ণ রূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঋতুচক্রকে দেখেছেন বলেই ষড়ঋতুর সবগুলিই তাঁর কাব্যে স্থান লাভ করেছে।

তবে রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষাঋতুর প্রাধান্য, আয়তন এবং গভীরতা উভয় দিকের বিচারেই। ভারতীয় সাহিত্যে সর্বদাই বর্ষাঋতু প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এর ব্যাবহারিক দিকটা ছেড়ে দিলেও বলা চলে, বর্ষার শান্তসজল রূপের সঙ্গে ভারতীয় জীবনধারার শান্ত গতির বোধ হয় কোনখানে একটা মিল আছে। রামায়ণে সীতাহরণের পর রামের বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে কবি কতগুলি বর্ষাবর্ণনার অবতারণা করেছেন। সেখানে আমাদের আদিকাব্যেই বর্ষাবর্ণনার যে দক্ষতা চিত্র এবং সংগীতের সমন্বয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার তুলনা আজকের সাহিত্যেও বড় বেশি নেই। কালিদাসের কাব্যে ষড়ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে একথা বলেছি। ঋতুগুলি তাঁর কাব্যে শুধু

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ নয়, তারা ঋতুপুরুষ বা নারী, মানবমনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে তারা যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাব্যের সবগুলি ঋতুবর্ণনাকেই অনুরঞ্জিত করেছে, তবু বর্ষাবর্ণনাতেই এর চরমত্ব। অন্য ঋতুতে মানুষের ভোগলালসার ইঙ্গিতটুকু যেন বেশি স্পষ্ট, কিন্তু বর্ষাঋতুর বর্ণনায় এই লালসাকে কবি অকথিত বাণীতে ভরা দেহাতীত প্রেমের রাজ্যে এনে উপস্থিত করেছেন। কালিদাস রাজসভার কবি, কাজেই তাঁর বর্ণনায় আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ ছিল। অন্যান্য ঋতুবর্ণনায় এই সমারোহটাই প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু বর্ষাবর্ণনায় মানবমনের ব্যাকুলতা এবং দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ বিরহী হৃদয়ের চিরন্তন ক্রন্দনটিরই প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের এবং কালিদাসের কবিপ্রতিভায় এস্থলে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। বাঙলার বৈষ্ণবকাব্যে বসন্ত বিশেষভাবে মিলন এবং ভাবোচ্ছ্বাসের ঋতু, কিন্তু বর্ষা বিরহ এবং ভাবগভীরতার ঋতু। সেখানেও আয়তনে না হোক গভীরতায় বর্ষারই শ্রেষ্ঠত্ব। বর্ষাঋতুর প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও বিশেষত্ব দিয়েছে। বিরহ-মিলন হাসি-কান্না ব্যর্থতা-সার্থকতায় ভরা তাঁর কবিজীবনের অনুভূতির সঞ্চয়গুলি ঋতুতে ঋতুতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বর্ষাঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্পদের মধ্যে কবি তাঁর গভীর অনুভূতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বেশি করে। বর্ষার আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণে এই গভীরতার রূপ কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বসন্তের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে সেই গভীরতা নেই। শেষবর্ষণ গীতিনাট্যের নটরাজ কবির এই অনুভূতির ভাষা দিয়েছেন: 'বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই, কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্লা রাতে হাসি বলছে আমার জিৎ, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালা-বদল।' মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না এবং কোমল-কঠোরের সংমিশ্রণে বর্ষার একটি পরিপূর্ণ রূপ রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন। সেটা কবিহৃদয়ে গভীর বিশ্বাসের সমগোত্রীয় বলেই বর্ষাঋতু তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

বসন্ত ঋতুও সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই কবিদের পক্ষপাত লাভ করে এসেছে। বসন্ত মিলনের উচ্ছ্বসিত আবেগ ও উচ্ছল মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে শিবের হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য কন্দর্প বসন্তঋতুর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই অকালবসন্তের বর্ণনাটি বসন্তঋতুর প্রতি

কবি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিকে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে প্রতিফলিত করেছে। বাঙলার বৈষ্ণবকাব্যেও মিলনের পটভূমিতেই বিশেষভাবে বসন্তকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেখানেও বসন্ত উপভোগেরই ঋতু। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্ছল উপভোগ প্রাধান্য পায়নি, তবু বসন্ত প্রধানত আনন্দ উপভোগের ঋতু। বসন্তকে কবি নবযৌবনের প্রতীক বলে কল্পনা করেছেন, কিন্তু সে নবযৌবন অপরিণত নয়, আপনার আনন্দের সঞ্চয়কে সে শুধু দুহাতে নিঃশেষ করে দেয় না। প্রৌঢ়অনুভূতির স্পর্শে 'ফল ফলাবার শাসনে' সে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

শরৎঋতুও আমাদের পূর্ববর্তী সাহিত্যে একটি প্রধান স্থান লাভ করেছিল তবু বর্ষা এবং বসন্তের মতো নয়। রামায়ণে খুব সুন্দর শরতের বর্ণনা রয়েছে। কালিদাসের কাব্যেও শারদশ্রীর নারীমূর্তি কল্পিত হয়েছে। বর্ষা এবং বসন্তের মতো শরৎঋতুকেও রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন রূপে অভিষিক্ত করে তুলেছেন। শরতের কাঁচা রৌদ্রে আর আলোছায়ার খেলায় যে উদাসীনতার আমেজ আছে সেটি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, এর মধ্যে তিনি একটি অর্ধস্ফুট রোমানটিক আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছেন। শরৎকে কবি আসক্তিহীন নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শারোদৎসব নাটকে মন্ত্রীর উক্তিতে এই রূপটি ফুটে উঠেছে : 'কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।··· শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।'

বর্ষা-বসন্ত-শরতের প্রতি কবির এই পক্ষপাতের জন্যই তিনি এই তিনটি ঋতুকে অবলম্বন করে নাটক বা গীতিনাট্য রচনা করেছেন। বর্ষাকে নিয়ে রচিত হয়েছে শেষবর্ষণ, আর তার পরিবর্তিত রূপ শ্রাবণ-গাথা, বসন্তকে নিয়ে ফাল্গুনী, বসন্ত ও নবীন, আর শরতকে নিয়ে শারোদৎসব ও পরিবর্তিত রূপ ঋণশোধ।

এখন রবীন্দ্রনাথের গান এবং ঋতুনাট্যগুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ঋতুর যে মূর্তি কল্পিত হয়েছে তার পরিচয় দিতে অগ্রসর হব।

৩

রবীন্দ্রকাব্যে, গ্রীষ্মঋতুর একমাত্র প্রতিনিধি বৈশাখ। বৈশাখের মধ্যে তিনি তপোবহ্নির শিখায় দীপ্ত রুদ্রসন্ন্যাসীর রূপ দেখতে পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের রুক্ষ গেরুয়া প্রান্তরের উদার বিস্তৃতিতে এই রুদ্রসন্ন্যাসীর তপোবহ্নির নির্বাণহীন আলো তাঁর চোখে বিশেষ করে ধরা পড়েছিল।

নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক জাগি॥

পুরাতন বৎসরের মুমূর্ষু অস্তিত্বকে নবীন প্রাণের নিশ্বাসে উড়িয়ে দিয়ে এই তাপসের আবির্ভাব, জীর্ণ পুরাতনের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই, প্রলয়ের শঙ্খধ্বনিতে যতো ক্ষুদ্রতার কান্না নিমেষের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে নূতন সুরে সে আকাশকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥

বাইরের আকাশে বৈশাখের এই রুদ্র আবির্ভাব কবির অন্তর্লোকেও রসের উৎস উন্মথিত করে তোলে। বৈশাখ বিশ্বজগতের অধিদেবতা নটরাজেরই প্রতিচ্ছবি। 'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্নথিত হতে থাকে।'[১] বৈশাখের রুদ্রদীপ্তির বাহ্যিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি কবির অন্তরে ভাববেগ জেগে ওঠে।

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে॥

১ নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, ভূমিকা; রচনাবলী অষ্টাদশখণ্ড।

তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥
বুঝি না, কিছু না জানি,
মর্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্র বাণী।
দিগ্‌দিগন্ত দহি দুঃসহ তাপ বহি
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে ॥

বৈশাখের কঠোর দৃষ্টি রুদ্রবাণী আর শুষ্ক নিশ্বাস থেকে কবির ভাবলোক যে অনুভূতি সঞ্চয় করেছে, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর বিশেষত্ব তার মধ্যে স্বয়ম্প্রকাশ। আপনার কোমল অনুভূতিগুলিকে ত্যাগের রুক্ষতায় পুড়িয়ে নিয়ে বাইরের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ থেকে অন্তর্লোকের ধ্যানমগ্ন নির্জনতায় কবি বৈশাখকে আহ্বান করেছেন। বৈশাখের তপস্বিনী ধরণীর সঙ্গে কবির অন্তরের এই তপশ্চর্যার মিলন তাই সুন্দর হয়ে উঠেছে।

তপস্বিনী হে ধরণী, ঐ যে তাপের বেলা আসে
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।
অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অন্তঃশীলা
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক হোমাগ্নিনিশ্বাসে ॥
যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহু গীতে
এক হয়ে মিশে যাক মৌনমন্ত্র ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা কুসুমিত চঞ্চলতা
সাজুক লাবণ্য লক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে ॥

যৌবনের উচ্ছল আনন্দের কাছে বাইরের প্রগল্‌ভ প্রকাশের সজ্জা যতই সুন্দর হোক, প্রৌঢ় অনুভূতির কাছে ত্যাগের ধূসর বাস তার চেয়ে বেশি কাম্য। বৈশাখ তাই উত্তরজীবনেই রবীন্দ্রনাথকে বেশি করে আকর্ষণ করেছে। পূর্বেই আমরা বলেছি প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতি কবির যতই আকর্ষণ থাক, তিনি মূলত শান্তরসের কবি। তাই বৈশাখের রুদ্রনৃত্যে শুধু সর্বনাশ এবং নিঃশেষের চিত্রই তিনি দেখেননি, এই রূপের অন্তরালে অন্তঃশীলা শান্তিটিই তাঁর শেষ সঞ্চয়। বৈশাখের রুদ্রদাহটিকে সন্ধ্যার শান্ত নীরবতায় অথবা স্নিগ্ধ

মেঘের শ্যামল সুধায় পৌঁছিয়ে দিয়েই তবে কবিহৃদয় পরিণতির শান্তি লাভ করেছে।

সারা হয়ে এলে দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে শান্ত হইয়া রবে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে।
—হে তাপস, তব শুষ্ক

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে ॥···
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্তনয়ন মেলে।
ভীষণ, তোমার প্রলয় সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ-যে আশার ভাষা উঠল বেজে
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে ॥

৪

এই 'তরুণ শ্যামল রূপী'র 'করুণ সুধা' বর্ষণেই ধরণীর অঙ্গণে আর কবির চিত্তাকাশে বর্ষার আহ্বান মুখরিত হয়ে ওঠে।

এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥

ধরণীর কঠিন তপস্যা শেষ হয়েছে, ত্যাগের দীপ্ত আভা তাই নূতন মিলনে শ্যামল হয়ে উঠেছে, বৈরাগী প্রকৃতির দেহে তাই আবার কুসুমের রোমাঞ্চ জেগেছে।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে ॥
অঝোরঝরণ শ্রাবণজলে
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে ॥

কবির ভাবলোকও বৈশাখের কঠিন তপশ্চর্যায় নির্মল হয়েছে, সেখানেও এসেছে প্রেমের অমরলোকের বার্তা। ত্যাগের কঠিন দীক্ষার শেষে আবার মিলনআনন্দে কবিহৃদয় উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

বনের ছায়ার জল-ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
—আমার দিন ফুরালো

বৈরাগ্যে ধরণীর দীক্ষা হয়েছে, সব উজাড় করে দিয়ে দেবার মন্ত্রও তার জানা। তাই 'শ্যামল সুন্দর' বর্ষার পায়েও তার নবপ্রস্ফুটিত শোভার ডালি পরিপূর্ণভাবেই অঞ্জলি দিয়েছে।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই ॥...
আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমার
চরণ যখন ছুঁই ॥

এই আত্মনিবেদনের পথেই ঈপ্সিত মিলন এসেছে, বর্ষার শোভায় শোভায় সে মিলনের বাণী মুখর হয়ে উঠেছে।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥

উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥

এই আনন্দ উৎসবে কবি শুধু বাইরের দর্শক নন। ধরণীর সঙ্গে কঠিন ত্যাগের মন্ত্রে তাঁরও ভাবলোকের দীক্ষা হয়েছিল, আজ আনন্দের উৎসবেও তাই তাঁরও আমন্ত্রণ প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে—
আজি সজল বায়ে শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে গানে গানে ॥
—বাদল-মেঘে মাদল বাজে

আকাশ আর ধরণীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে কবিমন বর্ষার বাণীকে প্রকৃতির মতো করেই উপভোগ করেছেন।

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥…
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে ॥
ম্লান স্মৃতির বাণী যত পল্লবমর্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি,
মম জল-ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে।

বর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে, মিলনের ব্যাকুলতা, বিরহবেদনা এবং অকারণ উৎকণ্ঠার ঋতু করেই এঁকেছেন। বর্ষার মিলনের আনন্দের সঙ্গে কি যেন ব্যথা বাজতে থাকে, শ্রাবণের মেঘের মাঝখানে হৃদয় হারিয়ে যায়, যূথীর গন্ধে বাদল ধারার সুরে মনের কথাগুলি যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম

অনতিস্পষ্ট রোমানটিক অনুভূতির ঋতু বলেই বর্ষাকে বিশেষভাবে স্নিগ্ধ শান্ত এবং কোমল করে আঁকতে হয়েছে। কিন্তু শুধু মধুর এবং কোমল জিনিস অসম্পূর্ণ। শেষবর্ষণের নটরাজের ভাষায়: 'মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন'। কাজেই বর্ষার কঠোর এবং রুদ্ররূপও আছে।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ-যে আমার চোখের.'পরে নাচে ॥
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালোআভার কাঁপন দেখ তালবনের ঐ গাছে গাছে।

ভিন্ন ভিন্ন গানে কবি এই কোমল কঠোরকে রূপ দিয়েছেন তা নয়, কোমল এবং কঠোরে তাঁর একটি সংগীতেই বর্ষার পরিপূর্ণ রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে তারও প্রমাণ আছে।

মন মোর মেঘের সঙ্গী,
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে,
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণসংগীতে
রিমিঝিম-রিমিঝিম-রিমিঝিম।

বর্ষার শান্ত বর্ষণে কবির ব্যাকুল মনের ভাবলোক উধাও হয়ে যাওয়াতে অকারণ উৎকণ্ঠার আভাস আর কোমলতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কলিতে শ্রাবণের ক্ষুব্ধ সৌন্দর্যের প্রলয় আহ্বানের মধ্যেও কবির আমন্ত্রণ অনুরূপ গভীর সুরেই বেজেছে।

মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিত ক্বচিত চকিত তড়িতআলোকে।
ঝঞ্জন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে।
কল কল কল মন্দ্রে নির্ঝরণী
ডাক দেয় প্রলয়-আহ্বানে ॥

বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে
উচ্ছল ছলছল তটিনীতরঙ্গে
মন মোর ধায় তারি মত্তপ্রবাহে
তালতমাল-অরণ্যে—
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে ॥

বর্ষার এই বর্ণনাতে অসামান্য সাফল্য যে, কোনো কবির ঈর্ষার সামগ্রী। বিভিন্ন ঋতুগুলিকে ঋতুপুরুষ বা ঋতুনারী রূপে আঁকবার চেষ্টা আমরা আমাদের প্রাচীনসাহিত্যেই দেখতে পাই। কিন্তু বর্ষার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি নারীরূপের সন্ধান যেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। বহু সংগীতে তিনি এই রূপটির পরিপূর্ণ অথবা আংশিক ইঙ্গিত করেছেন। একটি বর্ণনাতে বর্ষার ধারাপাতে স্নিগ্ধ নীপবন আর উন্মত্ত তরঙ্গলালায় উচ্ছল তটিনীর পটভূমিতে বর্ষার যে নারীমূর্তি কল্পিত হয়েছে তার তুলনা নেই।

মধুগন্ধে-ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া নীপকুঞ্জতলে
শ্যামকান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে
ফিরে রক্ত-অলক্তকধৌত পায়ে
ধারা সিক্ত বায়ে,
মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি প্রান্তে জ্বলে ॥
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা
উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গদোলে
কলমন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে ॥

রবীন্দ্রনাথ নিজের যুগ থেকে মাঝেমাঝে পূর্ববর্তী কবিদের সৃষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমির রাজ্যে অভিসার করেছেন। এই অভিসার প্রায়ই সাধিত হয়েছে বর্ষাঋতুর মধ্যস্থতায় আর কবির অভিসার পথের সীমা কালিদাসের যুগে।

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষনে ॥

যে-মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে ॥
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে ॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত বিকশিত বয়নে।

—ঐ আসে ঐ

বর্ষার সঙ্গে তমাল-কদম্ব, যুঁই-কেয়া এবং অভিসার ও অকারণ উৎকণ্ঠার যে সংস্মৃতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মনে জড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তার পরিণতি আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট বর্ষার আর একটি রূপ আছে। সেটি তাঁর যুগের এবং বিশেষ করে নদীধৌত শ্যামল বাঙলার বর্ষার রূপ। বর্ষার সংস্মৃতিগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের যুগের নূতন সংস্মৃতিও যোগ করে দিয়েছেন।

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে আয়গো আয়।
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায় ॥
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয় নিয়ে আয় ঘট,
পথের দুধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায় ॥

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা
খঞ্জন দুটি আলস্য ভরে ছেড়েছে খেলা।...
একাকার হল তীরে আর নীড়ে তালতলায়
আয় গো আয়॥

নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর, আউসের ক্ষেত জলে ভরভর
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে॥
ওই শোনো শোনো পারে যাবে বলে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।...
ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন
ধবলীরে আনো গোহালে,
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি,
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখাল বালক কি জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে।

এই বর্ণনা যেন আমাদের বহু পরিচিত, তবু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলার পল্লীর এই বর্ষার রূপটি সাহিত্যে স্থায়ী রূপ লাভ করবার জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

৫

প্রাচীন সাহিত্যে শরৎঋতুর একটি নারীরূপ ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সে রূপটি বিকশিত হয়ে উঠেছে। সে রূপ-অঙ্কনে মৌলিকতা এবং কবিত্ব আছে সন্দেহ নেই তবু মোটামুটি সেটা প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই শারদশ্রীর একটি নূতন রূপও আছে। শরতের রৌদ্রছায়ার

খেলায়, বিচ্ছিন্ন বর্ষণে আর শিউলি ফুলের উদাস গন্ধে কি যেন একটা অজানা রহস্য ঘুরে বেড়ায়। কবির রোমানটিক মনের কাছে তার আবেদন প্রচুর।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া ॥
কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন,
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া ॥

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা যায় বয়ে কেমন বিনা কারণে ॥
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে ॥

এই উদাস অবকাশের রোমানটিক সুর কবির মনে যে আসক্তিহীন রাগিনী বাজিয়ে তুলেছে শরৎসম্বন্ধে কবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গি তারই অনুরণন। শারোদৎসব নাটকেও তিনি শরৎকে অনাসক্ত নিঃসম্বল সন্ন্যাসী বলেছেন, তার কোনো সঞ্চয়ের বন্ধন নেই, তাই নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে কোনো আশঙ্কাও নেই। শারোদৎসবের মন্ত্রীর উক্তি : 'হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা ক্ষেতের আবার মূল্য কি ? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি, এই হলেই দেনা পাওয়া চুকে যাবে।' এই সঞ্চয়হীন নিঃসম্বলতা এবং পরিণামহীন স্বচ্ছন্দ অবকাশের ইঙ্গিত আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ শরতকে ছুটির ঋতু বলে অভিহিত করেছেন। শারোদৎসবের প্রথমেই আছে।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।

শারোদৎসবের বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ, সঞ্চয়অভিজ্ঞ লক্ষেশ্বর পর্যন্ত বলেছেন : 'আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে।'

শরতের অবকাশের সৌন্দর্যটি বিশেষ করে বাঙালির মনেরই সামগ্রী।

পূজার দীর্ঘ অবকাশের সঙ্গে শরতের অবকাশের সুরটি যেন মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব ভঙ্গিতে এই রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু অর্থহীন অবকাশের মধ্যে যে অনর্থের সম্ভাবনা আছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন না। এই অবকাশের আনন্দ যদি নিজের কর্তব্যকেও ভুলিয়ে দেয় তবে সে আনন্দ ক্ষতিকর। শারোদৎসব নাটকে অন্যান্য ছেলেরা যখন অবকাশের উৎসবে মত্ত তখন উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করার জন্য পুঁথি নকল করতে বসে গিয়েছিল। সেইদৃশ্য দেখে শিশুদের আনন্দের সঙ্গী ঠাকুর-দাদার মনে দুঃখ বেজেছিল : 'আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরি মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে, এও কি চক্ষে দেখা যায়? এর উত্তরে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বলেছিলেন : 'বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে? ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন।...তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।'

ঋণশোধের আয়োজন আর অবকাশের আনন্দকে এমন সুন্দর করে মিলিয়ে দিয়েছেন বলেই শরতের অবকাশ আরও সুন্দর হয়েছে। এর থেকে কবির একটি বিশেষ দর্শনের ও সৃষ্টি হয়েছে।

'আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে! বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে! সেই-জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই-জন্যেই এত সৌন্দর্য।'[১]

বাঁধনহীন সৌন্দর্য প্রেম বা অবকাশের উপভোগ কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্রয় পায়নি। শরতের ছুটির আনন্দকেও তাই তিনি ঋণশোধের

১ শারদোৎসব, সন্ন্যাসীর উক্তি।

কঠিন সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

৬

হেমন্ত এবং শীতকে নিয়ে কবি কোনো স্বতন্ত্র ঋতুনাট্য রচনা করেন নি। কিন্তু সংগীত-রচনার মধ্যে এই ঋতুগুলিরও এক একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। হেমন্তলক্ষ্মীর নারীরূপটি সুন্দর।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।

হেমন্ত সোনার ধানে তার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করে ধরণীকে ঢেলে দেয় কিন্তু নিজের ভূষণবিহীন অঙ্গসজ্জায় বৈরাগ্য বহন করে, কুয়াশার আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে সে শুধু নিজেকে রিক্ত করে দিতে জানে।

ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা॥

—হায় হেমন্তলক্ষ্মী

হেমন্তের এই দানরিক্ত বিরলভূষণ রূপটির পরিপূর্ণতা শীতঋতুতে। ঋতুনাট্যের অধিদেবতা নটরাজের শুষ্ক কঠিন রূপের প্রতিচ্ছবি শীতের প্রাকৃতিক দৃশ্যে।

একী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে।
আমার সয় না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে॥
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ
আপন ভুবন-মাঝে॥

বসন্তের পলাশকাঞ্চনের প্রগল্‌ভতায় যে নবযৌবনের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে শীতের রিক্ত বৈরাগ্যের তপস্যা যেন তারি জন্য প্রস্তুতি। এই তপস্যার জন্য সে নিজস্ব পরিবেশ রচনা করে নেয়।

সইবে না সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রং ঘুচাল ঝুমকো-লতা।
উত্তর বায় জানায় শাসন, পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে ॥
—শীতের বনে কোন্ সে

৭

এই তপশ্চর্যার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দের উৎস থেকে মুক্ত নবীন প্রাণের উচ্ছলতা নিয়ে ঋতুচক্রের শেষ ঋতু বসন্ত প্রবেশ করে রঙ্গমঞ্চে। শীতের পুরনো আচ্ছাদন ঘুচিয়ে তার প্রবেশ, শীতের জড়তা তারি স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাই বসন্ত নবযৌবনের ঋতু।

বসন্ত মিলনদিনের ঋতু, বিরহ আর মিলনাকাঙ্ক্ষা যে বসন্তে নেই তা নয়, তবু বিশেষ করেই আনন্দের উচ্ছলতা এর বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সে উচ্ছল বসন্তের স্পর্শ আছে।

নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদের দ্বারে
আয় আয় আয়,
পরিবি গলার হারে।...
বনমাধুরী করিবি চুরি আপন নবীন মাধুরীতে,
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে, আয় আয় আয় ॥

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করোনা বিড়ম্বিত তারে ॥
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো
এই সংগীতমুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

এই আনন্দের প্রগল্‌ভ লীলায়, নবযৌবনের ক্ষ্যাপামির তরঙ্গে ফুলে ফুলে, শোভা থেকে নূতন সুষমায় বসন্ত কেবলি আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে থাকে।

ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।...
জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কি হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সেদিন তালে তালে
'চরম দেওয়ার সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে'।

কিন্তু বসন্তের এই উদ্দাম ক্ষ্যাপামিকে কবি চরম বলে মেনে নিতে পারেন নি। পরিণামহীন ব্যয় কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না, লক্ষ্যহীন আনন্দও তাঁকে পীড়া দেয়। বসন্তের নীড়হাবা বিহঙ্গদের তাই তিনি আবার নীড়ে ফিরে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন।

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ।
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দাম তরঙ্গ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহারা বিহঙ্গ॥...
প্রখর তাপে জরজর ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার এই হোক ভঙ্গ॥

ফুলের পরিণাম হীন বর্ণবিলাস থেকে ফলের পরিণত সার্থকতায় কবির বসন্তের পরিপূর্ণতা।

পূর্বেই বলেছি বসন্তকে কবি নবযৌবনের ঋতু বলেছেন। গীতিনাট্য নবীন নামটিতেও এর স্বাক্ষর আছে। কিন্তু পরিণামহীন আনন্দ কবির বিশ্বাসের সঞ্চয় নয় বলেই শুধু লক্ষ্যহীন নবযৌবন কবিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। বসন্ত এবং ফাল্গুনী নাটকে তাই বসন্তের প্রৌঢ় পরিণতির রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বসন্ত নাটকে :

রাজা— ঐ জীর্ণ বসন পরে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি— তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পালটে নেন তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা।

বসন্তের মধ্যে শীতের পাতাঝরার শেষ পর্বটুকু লেগে থাকে, আবার নূতন পাতায় রিক্ত শাখাগুলি ভরে উঠে। এ-নবযৌবনে, প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শ টুকুও লেগে থাকে। তাই এ যৌবন শুধু উচ্ছল নয় প্রৌঢ় অনুভূতির শাসনে এর প্রগল্‌ভতা নিয়ন্ত্রিত। ফাল্গুনী নাটকেও এই ভাবটি কবি অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন: 'প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, তারা ফলতে চায়।' কবির দৃষ্টিতে বসন্তের মধ্যে এই নিরাসক্ত যৌবনটি ধরা পড়েছে। শীতের বার্ধক্যস্পর্শ পেরিয়ে দ্বিধাহীন ব্যয়কে 'ফল ফলাবার শাসনে' নিয়ন্ত্রিত করে বলেই বসন্ত বিশেষভাবে সার্থক। ফাল্গুনীতে কবি বলেছেন: 'বিশ্বের মধ্যে যে বসন্তের লীলা চলেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।'

এই নাটকে ছেলের দল বার্ধক্যের অদেখা ভূতটিকে কোথাও খুঁজে পায়নি। দৃশ্যজগতে যখন যৌবনের আনন্দ ফুরিয়ে আসে তখন অদেখা মনের জগতে প্রৌঢ় অনুভূতির নূতন যৌবন দেখা দেয়। বসন্তের ফুলের প্রগল্‌ভ আনন্দ আর পরিণত ফলের আনন্দের মধ্য দিয়ে কবির মনে এই বিশ্বাসের সাদৃশ্যটি ধরা পড়েছে। বসন্ত তাই কবির দৃষ্টিতে নূতন রূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। কবির 'নবীন প্রাণের বসন্ত' ক্ষয়হীন চিরযৌবনের গানে মুখর।

নির্দেশিকা

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

তিন টাকা